মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

৫ম বর্ষ
৫ম সংখ্যা
আগস্ট-২০২৫ ঈসায়ী
সফর-রবিঃ আউঃ-১৪৪৭
শ্রাবণ -ভাদ্র-১৪৩২

মসজিদটি মক্কার তানিম নামক স্থানে অবস্থিত এ জন্যে মসজিদে তানিম নামে পরিচিত। আর এখান থেকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার ইহরাম বেঁধে ছিলেন, তাই মসজিদে আয়েশা নামেও পরিচিত।

মসজিদে তানিম
সৌদি আরব

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

রেজি নং ডি.এ. ১৪২

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৩য় পর্ব

৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

আগস্ট ২০২৫ ঈসায়ী

সফর-রবিউল আওয়াল ১৪৪৭ হিজরী

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩২ বাংলা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক

প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী

সহযোগী সম্পাদক

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন বিন আবদুর নূর

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মোঃ রমাযান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ডক্টর দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ডক্টর মো. লোকমান হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন
ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন
শাইখ আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী
শাইখ ইসহাক বিন ইরশাদ মাদানী

সম্পাদক
০১৭১৬-১০২৬৬৩
সহযোগী সম্পাদক
০১৭২০-১১৩১৮০
ব্যবস্থাপক :
০১৯১৬-৭০০৮৬৬

যোগাযোগ : মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
ফোন : ০২-২২৩৩৪২৪৩৪ মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
ই-মেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd
www.ahlahadith.net.bd
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

সার্কুলেশন বিভাগ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
বিকাশ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক
তর্জুমানুল হাদীস
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
রেজি নং ডি.এ. ১৪২
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا-١١٠٠ الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٦١٠٢٦٦٣
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي رحمه الله، المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق، رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور أحمد الله ترياشي، مساعد التحرير: الشيخ مفضل حسين المدني.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং-২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০, ০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচীপত্র

দারসুল কুরআন

❖ **প্রকৃত মুমিনের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য।** ৩
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক

দারসুল হাদীস

❖ **সংঘবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তা।**.....৬
শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা

সম্পাদকীয়

প্রচলিত গণতন্ত্র : রাষ্ট্র পরিচালনায় এর যথার্থতা এবং সালাফি মাশাইখদের দৃষ্টিভঙ্গি। ৯

প্রবন্ধ :

❖ **রাজকীয় মেহমান হিসেবে হজ্জ পালন : অনুপম অনুভূতির লেখচিত্র।**..১০
আবূ সা'দ ড. মো: ওসমান গনী

❖ **সালাফী আলেম-ওলামার প্রতি আল্লামা রাবী' (রহ)-এর বিশেষ ওসিয়ত।**.....১৩
মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ বিন আব্দুল জলীল

❖ **শাইখ ডক্টর রাবী' বিন হাদী উমায়ের আল-মাদখালী (রহি) : আপোষহীন এক সালাফী বিদ্বান।**.....১৫
শাইখ আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল ফারুক

❖ **ইবাদতের পরিচয় ও শর্তাবলী।**.....২২
আবু মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ

❖ **কালো জাদু ও বদ নজর নিয়ে কিছু কথা।**.....২৭
সাইদুর রহমান

❖ **অহংকার পতনের মূল।**.....৩৩
মোঃ আরিফ ইসলাম

শুব্বান পাতা

❖ **কাফী জীবনে তিনটি পত্রিকা সমাচার ।**.....৩৮
মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম

❖ **কবিতার সমাহার?**..... ৪৩

❖ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল।**.....৪৪

দারসুল কুরআন/ مزدروس القرآن

প্রকৃত মুমিনের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব *

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾

যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে না এবং যথার্থতা ছাড়া কোনো প্রাণ হত্যা করে না, যা আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন। আর তারা ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সে সেখানে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল থাকবে।[১]

আয়াতে কারীমার প্রাসঙ্গিক বিষয় : আলোচ্য আয়াতে কারীমাতে আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

১. প্রকৃত ঈমানদার বান্দাগণ কখনও আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্যকে ডাকে না। অর্থাৎ তারা সর্বদা তাওহীদের ওপর অটল থাকে এবং শিরক থেকে নিজকে হেফাজত করে।

২. তারা কখনও অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না।

৩. তারা কখনও যেনা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। কারণ এ তিনটিই সবথেকে বড় গুনাহগুলোর অন্যতম।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কোন গুনাহ সবথেকে বড়? উত্তরে তিনি বললেন : আল্লাহর সাথে অন্যকে সমকক্ষ দাঁড় করানো। আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : আমি বললাম, এরপর কোন গুনাহ? রাসূল (ﷺ) বললেন, খাদ্য খাওয়ানোর ভয়ে নিজ সন্তানকে হত্যা করা। আমি বললাম, তারপর কোন গুনাহ? তিনি বললেন : প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনা করা। অতঃপর রাসূল (ﷺ)-এর কথা সত্যয়ন কল্পে উল্লেখিত আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়।[২]

সুতরাং প্রকৃত ঈমানদার কখনও এই বড় অপরাধগুলো করে না। যে বা যারা এ অপরাধগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হবে অবশ্যই সে শাস্তির সম্মুখীন হবে, কারণ সে তো প্রকৃত ঈমাদার নয় বরং পাপাচারী। কেয়ামতের দিন তার জন্য দ্বিগুণ শাস্তি অপেক্ষা করছে।

আয়াতে কারীমার প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ :

১. আল্লাহ তা'আলার কথা :

﴿الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ﴾

যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে ডাকে না। অর্থাৎ যারা শিরক করে না।

শিরক শব্দটি আরবী, এর বাংলা অর্থ হলো : অংশীদার করা, বা অংশীদার বানানো। যেমন : বলা হয় যে, شركت بينهما فى المال সম্পদে উভয়কেই অংশীদার করলাম।[৩]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন :

لَيْسَ الشِّرْكُ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ فَحَسْبُ؛ بَلْ هُوَ أَيْضًا مُتَابَعَتُك لِهَوَاك وَأَنْ تَخْتَارَ مَعَ رَبِّك شَيْئًا سِوَاهُ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَالْآخِرَةِ وَمَا فِيهَا.

শুধু মূর্তি পূজার নামই শিরক নয়, বরং তোমার প্রবৃত্তির অনুসরণ করা এবং দুনিয়া ও তার মাঝের সকল বিষয়, আখিরাত ও আখিরাত মধ্যস্থিত সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্যকে পছন্দ করাই শিরক।[৪]

মূল কথা হলো আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত ও আসমাউ ওয়াস সিফাতের যতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলোর কোনো একটিতে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে যুক্ত করা বা পছন্দ করার নামই শিরক।

শিরকের ভয়ানক দিকগুলো কুরআন ও সুন্নাহয় বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।

---

* মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।

[১] সূরা ফুরকান আয়াত : ৬৮-৬৯।

[২] সহীহ বুখারী হা : ৪৭৬১।

[৩] মিসবাহুল মুনীর হা : ১৯৬।

[৪] মাজমুউল ফাতাওয়া ১০/৫১৮ পৃ. ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

যখন লুকমান হাকিম তার পুত্রকে উপদেশকালে বলেছিলেন, হে বৎস! আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশী কর না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করা বড় যুলুম বা অবিচার।[৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

যে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেনো সৎ আমল করে এবং তার প্রতিপালকের এবাদতে কাউকে শরীক না করে।[৬]

রাসূল ﷺ বলেন :

مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا: «مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ.

যে আল্লাহর সাথে শিরক করা অবস্থায় মারা যায় সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, আর যে আল্লাহর সাথে শিরক না করা অবস্থায় মারা যায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৭]

এ ছাড়া বহু হাদীসে শিরকের ক্ষতিকর দিকগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং একজন মুমিন বান্দা কখনই শিরক করতে পারে না।

(২) আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

তারা যথার্থতা ব্যতীত কোনো প্রাণ হত্যা করে না। অর্থাৎ, তারা অন্যায়ভাবে কোনো মানুষ খুন করে না। কারণ ইসলামে তিন শ্রেণীর মানুষ ব্যতীত অন্য যে কোনো মানুষকে হত্যা করা হারাম। যথাক্রমে : বিবাহিত যেনাকারী কিংবা যেনাকারিণী, হত্যার বিনিময়ে হত্যা ও ধর্মত্যাগী বা মুরতাদ। এ তিন শ্রেণীর মানুষ ব্যতীত অন্য যে কোনো মানুষ হত্যা করা হারাম।

বর্তমান সময়ে আমাদের বাংলাদেশে মানুষ হত্যা করা খুব সহজ হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় মশা কিংবা মাছি হত্যা করার থেকে যেন মানুষ হত্যা করা সহজ। অথচ যাকে হত্যা করা হয় এবং যে হত্যা করে উভয়ই মুসলিম। জাতিসংঘ জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০২৫ অনুযায়ী বাংলাদেশে শতকরা ৯১.১ শতাংশ মানুষ মুসলিম। সে দেশে এতো হত্যাকাণ্ড কি মেনে নেওয়ার মতো?

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنه রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন:

يَجِيءُ المَقْتُولُ بِالقَاتِلِ يَوْمَ القِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، يَقُولُ: يَا رَبِّ، قَتَلَنِي هَذَا، حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ العَرْشِ.

হত্যাকৃত ব্যক্তি হত্যাকারীকে নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে এবং হত্যাকারীর কপাল বা মাথা হত্যাকৃত ব্যক্তির হাতে থাকবে, আর তার ক্ষতচিহ্ন হতে তাজা রক্ত ঝরতে থাকবে। সে বলতে থাকবে : হে আমার প্রতিপালক এ লোকটা আমাকে হত্যা করেছে। এক পর্যায়ে তাকে আরশের নিকটবর্তী করবে।[৮]

রাসূল ﷺ বলেন :

لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ.

আসমান ও যমীনের সকল অধিবাসী যদি একজন ঈমানদার বান্দাকে হত্যার কাজে অংশগ্রহণ করে তবে আল্লাহ তা'আলা সকলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[৯]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

[৫] সূরা লুকমান আয়াত : ১৩।
[৬] সূরা কাহফ আয়াত : ১১০।
[৭] সহীহ বুখারী হা : ১২৩৮।
[৮] তিরমিযী হা : ৩০২৯।
[৯] তিরমিযী হা : ১৩৯৮।

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো ঈমানদারকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হলো জাহান্নাম, যেখানে সে চিরকাল থাকবে। আর আল্লাহ তা'আলা তার ওপর ক্রোধান্বিত থাকবেন এবং তাকে অভিশাপ দেন এবং তার জন্য বড় শাস্তি প্রস্তুত করে রাখেন।[১০]

অত্র আয়াতে কারীমা হতে বুঝা যাচ্ছে যে, হত্যা করা শুধু কাবিরা গুনাহই নয়, বরং জাহান্নামে যাওয়ার পথ সুগম করে ও তার ওপর আল্লাহর ক্রোধ ও লানত অবধারিত হয় যা দুনিয়ার জীবনকে লাঞ্ছনাগ্রস্থ করে এবং আখিরাতে কঠোর শাস্তি তার জন্য অপেক্ষমান থাকে।

একজন ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের জন্য ব্যাকুল থাকে বিধায় তিনি কখনও হত্যাকাণ্ডের মতো জঘন্যতম কর্মে সম্পৃক্ত থাকতে পারেন না এবং এটাই তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(৩) ولا يزنون এবং তারা ব্যভিচার করে না।

আল্লাহ তা'আলার মুমিন বান্দা কখনই যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না।

মেক্বদাদ বিন আসওয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ " لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ.

একদা রাসূল ﷺ সাহাবিদেরকে যেনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তারা বললেন : এটা আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ হারাম করেছেন। রাসূল ﷺ বললেন : কোনো ব্যক্তির দশজন নারীর সঙ্গে যেনা করা তার প্রতিবেশীর একজন নারীর সঙ্গে যেনা করার তুলনায় অতি নগণ্য।[১১]

দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান সময়ে প্রতিবেশীর নারীর সঙ্গেই যেনার প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয় যাকে পরকীয়া বলে অভিহিত করা হয়। যে আসক্তিতে সহোদর ভাই-বোনদের পতিত হওয়ার খবরও মাঝে মাঝেই পাওয়া যায়।

এর বাইরে ধর্ষণ ও যেনার কথা তো উল্লেখ করার মতো নয়?

বর্তমান সরকারের আমলেই ৫৬৩ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এ ছাড়াও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পতিতালয় ও কলেজ ভার্সিটির লিভ ইন তো রয়েছেই। পরিসংখ্যান অনুযায়ী মনে হয় ৯১.১ শতাংশ মুসলিম জনপদটি যেনো যেনা ব্যভিচারের উর্বর ভূমি!! (নাউযু বিল্লাহ)

রাসূল ﷺ বলেছেন : যখন কোনো মানুষ যেনায় লিপ্ত হয় তখন সে মুমিন থাকে না।[১২]

সুতরাং যেনাকারী কখনও মুমিন হতে পারে না আবার মুমিন কখনও যেনাকারী হতে পারে না।

আল্লাহর একনিষ্ঠ মুমিন বান্দা তো তিনি, যিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী, যার কাছে প্রত্যেক মানুষ এমনকি অন্যান্য প্রাণীও নিরাপদ থাকে এবং তিনি যাবতীয় শিরক ও বিদ'আতমুক্ত থাকেন। কারণ আল্লাহর সান্নিধ্যই তো তার জীবনের মুখ্য বিষয়।

আয়াতে কারীমার শিক্ষা :

১. সকল ইবাদত ও দাসত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য, তিনি ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়।

২. আল্লাহর একত্ববাদে একনিষ্ঠ বিশ্বাস প্রকৃত মুমিনের প্রথম বৈশিষ্ট্য।

৩. শিরকমুক্ত আমল যেমন জান্নাতের পথ উন্মুক্ত করে দেয় অনুরূপ শিরক মিশ্রিত আমল জাহান্নামের পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

৪. মানুষ হত্যা করা সবথেকে বড় গুনাহগুলোর অন্যতম।

৫. তিন শ্রেণীর মানুষ হত্যা করা শরীয়তে অনুমোদিত; বিবাহিত যেনাকারী, মানুষ হত্যাকারী ও মুরতাদ আর তা অবশ্যই রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যকর হতে হবে, অবশ্যই তা ব্যক্তিতান্ত্রিক নয়।

৬. স্বেচ্ছায় অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা দুনিয়াতে অপমান লাঞ্ছনা ও আখিরাতে জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

৭. যেনা সামাজিক অবক্ষয়ের মূল কারণের একটি, বিধায় গণসচেতনতা অত্যাবশ্যক এবং এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে শারঈ আইন অত্যন্ত কার্যকরী।

৯. আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রকৃত মুমিন হিসাবে কবুল করুন।

[১০] *সূরা আন-নিসা-আয়াত : ৯৩।*

[১১] *মুসনাদ আহমাদ ২৩৮৫৪, আল আদাবুল মুফরাদ ১০৩ সনদ সহীহ।*

[১২] *সহীহ বুখারী হা : ২৪৭৫।*

من أحاديث الرسول/দারসুল হাদীস

সংঘবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তা

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা ❖

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالجَابِيَةِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ: «أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنَّةِ فَلْيَلْزَمُ الجَمَاعَةَ، مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ.

হাদীসের অনুবাদ : ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : (সিরিয়ার অন্তর্গত) জাবিয়া নামক জায়গায় উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের সামনে খুতবাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বললেন : হে উপস্থিত জনতা! যেভাবে আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়াতেন, সেভাবে আমিও তোমাদের মাঝে দাঁড়িয়েছি। তারপর তিনি (রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)) বললেন : আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি (তাদের যামানা শ্রেষ্ঠ যামানা) তারপর তাদের পরবর্তী (তাবেয়ীদের) যামানা, তারপর তাদের পরবর্তী (তাবে-তাবেঈনদের) যামানা। তারপর মিথ্যাচারের বিস্তার ঘটবে। এমনকি কাউকে শপথ করতে না বললেও শপথ করবে, আর সাক্ষ্য প্রদান করতে না বলা হলেও সাক্ষ্য প্রদান করবে। সাবধান! কোনো পুরুষ কোনো মহিলার সাথে নির্জনে মিলিত হলে সেখানে তৃতীয়জন হিসাবে শয়তান অবস্থান করে। তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস কর। বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বিরত থাক। কেননা, শয়তান বিচ্ছিন্নজনের সাথে থাকে। সে দু'জন হতে অনেক দূরে থাকে। যে লোক জান্নাতের মধ্যে সবচাইতে উত্তম জায়গা পাওয়ার আশা করে সে যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে (মুসলিম সমাজে) বসবাস করে। যার সৎ আমল তাকে আনন্দ দেয় এবং অসৎ কাজ কষ্ট দেয় সেই প্রকৃত ঈমানদার।[১৩]

রাবী পরিচিতি :

নাম : আব্দুল্লাহ, পিতা : উমার ইবনুল খাত্তাব, মাতা : যয়নব বিনতু মাযঊন। উপনাম : আবূ আব্দুর রহমান। তিনি উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর আপন ভাই ছিলেন। মক্কাতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁর বাবা উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তার পিতার সাথে হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন। বয়সের স্বল্পতার কারণে বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অনুমতি পাননি। পনের বছর বয়সে তিনি খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সকল যুদ্ধেই অংশ গ্রহণ করেন। হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একজন সৎ ব্যক্তি।[১৪]

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : আমাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি ছিল না যে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয় নাই। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনু উমার এর ব্যতিক্রম। তিনি নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়া অনেক সাহাবী হতেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে স্বীয় পিতা উমার ইবনুল খাত্তাব, আবূ বকর সিদ্দীক, উসমান ইবনু আফফান, আলী ইবনু আবী তালিব, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, আবূ সাঈদ খুদরী, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, রাফে ইবনু খাদীজ, স্বীয় বোন হাফসা ও আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা আজমাঈন) থেকেও তাঁর নিকট হতে অসংখ্য রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে আসলাম

❖ মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[১৩] তিরমিযী হা : ২১৬৫ সহীহ।
[১৪] মুসনাদ আহমাদ- ২/৫, সহীহ বুখারী- ২/৬১।

মাওলা উমার ইবনুল খাত্তাব, স্বীয় ছেলে বিলাল ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, আনাস ইবনু সীরীন, বুসর ইবনু সাঈদ, তামীম ইবনু আয়ায, সাবিত ইবনু আসলাম আল বুনানী, সাবিত ইবনু উবায়দ, সাবিত ইবনু মুহাম্মদ আল-আবদী ও জাবালাহ ইবনু মুহায়ম আশ-শায়বানী প্রমুখ। তিনি ৭৪ হিজরী সালে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তার বয়স ছিল ৮৪ বৎসর।

ব্যাখ্যা : أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي আমি আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, অর্থাৎ আমার সহচরবৃন্দ আমার উম্মাতের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। কারণ তারা স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবলোকন করেছেন। তাঁর কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছেন। রাসূল ﷺ-এর মুখ থেকে তারা সরাসরি উপদেশমালা স্বীয় কর্ণে শ্রবণ করেছেন। আল্লাহর অবাধ্য হলে পরকালের শাস্তি এবং তাঁর আনুগত্য করলে পরকালের মহাপুরস্কার সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ফলে যেমন তাদের অন্তরে আল্লাহভীতির সঞ্চার হয়েছে তেমনি সৎ পথে চলার ফলস্বরূপ মহাপুরস্কারের কথা তাদের অন্তরে জাগ্রত হওয়ায় অন্যায় পথ পরিহার করে ন্যায় পথে চলার জন্য সর্বাত্মকভাবে নিজেকে নিয়োজিত রাখার ফলে তাদের অন্যায় কাজ অতি অল্প মাত্রায় সংঘটিত হওয়া কারণে তাদের যামানা আমার উম্মাতের মাঝে শ্রেষ্ঠ যামানা। অতএব তোমরা তাদেরকে তোমাদের অনুকরণীয় হিসেবে গ্রহণ করবে।

ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

এরপর তাদের পরবর্তী (তাবেঈদের) যামানা এবং তাদের পরবর্তীতে (তাবে' তাবেঈনদের) যামানাই হল উত্তম যামানা। অর্থাৎ সাহাবীদের সাহচর্য্য পাওয়ার দরুণ তাবেঈগণ আর তাবেঈনদের সাহচর্য পাওয়ার দরুণ তাবে' তাবেঈনগণ উত্তমরূপে জীবন-যাপন করার কারণে সাহাবাদের পরবর্তী এই প্রজন্মদের যামানাও উত্তম যামানার অন্তর্ভুক্ত ।

ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ.

এরপর মিথ্যাচারের বিস্তার ঘটবে এমনকি কাউকে শপথ করতে না বলা হলেও শপথ করবে অর্থাৎ মিথ্যাচারের বিস্তার ঘটার কারণে কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারবে না। তাই স্বীয় বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জনগণ শপথের আশ্রয় নেবে, ফলশ্রুতিতে তারা কথায় কথায় শপথ করে বসবে। যেমনটি অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

ما يزال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.

কোনো লোক সর্বদা মিথ্যা বলতে থাকবে এবং মিথ্যা বলা তার অভ্যাসে পরিণত হওয়ার ফলে লোকজনের নিকট সে মিথ্যুকরূপে পরিচিতি লাভ করবে। তাই এমন মিথ্যুক ব্যক্তিকে কেউ যখন আর বিশ্বাস করবে না তখন সে শপথের আশ্রয় নেবে। যদিও তাকে শপথ করতে কেউ বাধ্য করেনি।

وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ.

আর সাক্ষ্য প্রদান করতে না বলা হলেও সাক্ষ্য প্রদান করবে, অর্থাৎ মিথ্যাচারী ব্যক্তিকে তার মিথ্যাচারের প্রসিদ্ধতার কারণে কেউ তাকে সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য আহ্বান না করা সত্তেও সে লোকালয়ে উপস্থিত হয়ে কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করবে।

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.

কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে নির্জনে মিলিত হলে সেখানে তৃতীয়জন হিসাবে শয়তান অবস্থান করে, অর্থাৎ কোনো পুরুষ যখন কোনো পর-নারীর সাথে নির্জনে মিলিত হয় তখন শয়তান সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের উভয়ের মাঝে কামভাব জাগিয়ে তাদের দ্বারা ব্যভিচার করিয়ে থাকে। নাবী ﷺ এ কথা জানান দিয়ে তাঁর উম্মাতকে কোনো পর-নারীর সাথে মিলিত হওয়া থেকে সতর্ক করেছেন। যাতে শয়তান তাকে ব্যভিচারের পথে না নিয়ে যেতে পারে। عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস কর, অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মধ্য হতে একজনকে ইমাম

নির্বাচন করে তোমরা তার নেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করবে।

وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ তোমরা বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে দূরে থাকবে। অর্থাৎ তোমরা কোনোভাবেই নেতার নেতৃত্বকে অমান্য করে মুসলিম সমাজে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করবে না।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে :

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য থেকে বেড়িয়ে যাবে এবং ঐক্যবদ্ধ জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করবে জাহেলিয়্যাতের অবস্থায় তার মৃত্যু হবে।[১৫]

অতএব, ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে চাইলে মুসলিম নেতার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন-যাপন করতে হবে।

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ কেননা শয়তান বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সঙ্গী হয়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যখন ইমামের নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী জীবন-যাপন করতে থাকে তখন শয়তান তার সঙ্গী হয়ে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। আর সে একাকী থাকার কারণে সে ভুল করলেও কেউ তাকে আর সংশোধন করার সুযোগ পায় না তাই শয়তান তাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করার সুযোগ পায়, ফলে সে বিপথগামী হয়।

وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ শয়তান দু'জন হতে অনেক দূরে থাকে। অর্থাৎ দুইজন লোক একত্র থাকলে তাদের মধ্যে কোনো একজন ভুল করলে দ্বিতীয়জন তাকে সংশোধন করে দেয়, ফলে শয়তান তাকে আর যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে না। তাই বলা হয়েছে, শয়তান দু'জন থেকে অনেক দূরে থাকে।

مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ.

যার সৎ আমল তাকে আনন্দ দেয় আর অসৎ কাজ তাকে কষ্ট দেয় সে ব্যক্তি প্রকৃত ঈমানদার। অর্থাৎ সৎ কাজে আনন্দিত হওয়া এবং কোনো সময় শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে অসৎকাজ করে ফেললে নিজে নিজেই দুঃখিত হওয়া এবং কষ্ট পাওয়া ঈমানদার হওয়ার লক্ষণ। আর একমাত্র ঈমানদার ব্যক্তিই জান্নাতে যেতে পারবে। তাই ঈমান টিকিয়ে রেখে বাঁচতে চাইলে সংঘবদ্ধভাবে জীবন-যাপন করার বিকল্প নেই।

হাদীসের শিক্ষা :

১। উম্মাতে মোহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠ সন্তান হলেন সাহাবাগণ। অতএব তাঁরা অনুসরণীয় যতক্ষণ না তাদের কোনো কাজ রাসূল ﷺ-এর কাজ অথবা তাঁর নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক হয়।

২। তাবেঈ ও তাবে' তাবেঈনগণ মর্যাদার দিক থেকে সাহাবাদের পরেই তাদের স্থান।

৩। কথায় কথায় শপথ করা নিন্দনীয় কাজ।

৪। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

৫। পর-নারীর সাথে নির্জনে মিলিত হওয়া ব্যভিচারের (যিনার) রাস্তা খুলে দেয়। তাই এ ধরনের কাজ হতে সতর্ক থাকতে হবে।

৬। মুসলিম ইমামের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন-যাপন করা আবশ্যক।

৭। মুসলিম জামায়াত হতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সঙ্গী হয় শয়তান।

৮। শুধুমাত্র ঈমানদার ব্যক্তিগণই জান্নাত লাভে ধন্য হবেন।

৯। সৎ কাজ করে আনন্দ পাওয়া এবং অসৎ কাজে জড়িয়ে পড়লে দুঃখিত হওয়া ঈমানদার হওয়ার লক্ষণ।

১০। ভাল কাজের ফল সব সময় ভালই হয়। ❑❑

[১৫] *সহীহ মুসলিম হা : ১৮৪৮।*

সম্পাদকীয় | প্রচলিত গণতন্ত্র : রাষ্ট্র পরিচালনায় এর যথার্থতা এবং সালাফি মাশাইখদের দৃষ্টিভঙ্গি | الافتتاحية

নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, যার রয়েছে পর্যাপ্ত জনসংখ্যা, যেটি স্বাধীন ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী। সেই ভূখণ্ডটি সুষ্ঠুভাবে শাসনের জন্য প্রয়োজন সরকার। সরকার ঐ ভূখণ্ড বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য বাহিনী গঠন, স্বাধীনতা রক্ষায় শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা, টেকসই উন্নয়ন, সামাজিক সংহতি, অগ্রগতি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শিক্ষাস্বাস্থ্যসহ নাগরিকদের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে। মানবাধিকার সুরক্ষায় শক্তিশালী শাসন পরিচালনা করা সরকারের প্রধান দায়িত্ব। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যই হলো পরাধীনতামুক্ত হয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। সার্বিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি, সামাজিক স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য যত লড়াই, যুদ্ধ, সংগ্রাম, আত্মত্যাগ হয়েছে, আয়নাঘরের অন্ধকারে নিষ্ঠুর কারাবরণ, ফাঁসির দড়ি গলায় পরা, বছরের পর বছর কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে নির্মম নির্যাতনে জীবন হারানো মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রাম চলেছে দিনের পর দিন। বর্তমান সময়ে বিশ্বময় ১৯৫ রাষ্ট্র রয়েছে। ২টি রাষ্ট্র ভ্যাটিকানসিটি এবং ফিলিস্তিন বাদে ১৯৩ রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য। ১৯৫টির মধ্যে ৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্র। ১৯৩টি রাষ্ট্রে যেসব শাসনব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তন্মধ্যে রাজতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র, আমীরতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, একদলীয় গণতন্ত্র ও বহুদলীয় গণতন্ত্র অন্যতম। এ ছাড়াও কিছু দেশে রয়েছে গোত্রীয়শাসন, অলিগার্কিক শাসনব্যবস্থা, আছে থিওক্র্যাসিক শাসন। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর কোনোটিতেই ইসলামী শাসনব্যবস্থা চালু নেই পুরোপুরিভাবে। কয়েকটি রাষ্ট্র নিজেদের রাষ্ট্রের নাম ইসলামী প্রজাতন্ত্র রাখলেও ইসলামী শাসন, কুরআনিক বিধান, নেতা নির্বাচন বা রাষ্ট্র পরিচালনায় পরিপূর্ণ ইসলামী অনুশাসনের অনুসরণ নেই। কোথাও হুদুদ প্রতিষ্ঠায়, কোথাও কিছু সামাজিক নিয়ম ও নীতিমালায় ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন দেখা গেলেও পূর্ণাঙ্গ ইসলামের বাস্তবায়ন নেই বললেই চলে। 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিই বর্তমানে রাষ্ট্রপরিচালনার ম্যাকিয়াভিলিক আদর্শ। রাষ্ট্রনায়ক বা পরিচালকদের জন্য- তন্ত্র যাই হোক, মন্ত্র একটাই, ক্ষমতা আমার চাই' ক্ষমতাই মুল লক্ষ্য। যে কারণে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নির্মম নিষ্ঠুর, ফ্যাসিস্ট, স্বৈরাচার হতেও শাসকদের আপত্তি নেই। গুম, হত্যা, নিষ্ঠুরতা, বাহানা কৌশল, জোটসহ এহেন কাজ নেই যা ক্ষমতালিপ্সুরা করে না। চাই তা রাজতন্ত্র হোক বা সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র বা পরিবারতন্ত্র। তবে জনগণের অংশগ্রহণে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার এখনো সর্বাধিক জনপ্রিয় ও প্রশংসিত এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন বলে মনে করে অনেকে। তবে প্রচলিত পশ্চিমা এ গণতন্ত্রেরও রয়েছে ব্যাপক সমালোচনা। কেননা বিশ্বে অনেক দেশে গণতান্ত্রিক শাসন বলবৎ থাকলেও তা বাস্তবে কোথাও কঠিন একনায়কতন্ত্র (উত্তর কোরিয়া) কোথাও একদলীয় শাসন (চীন) অথবা জনগণের অধিকারের কথা বলে জনগণের অধিকার হরণের হাতিয়ার হিসেবে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শাসনরূপে পরিচিতি এই গণতন্ত্র। বাংলাদেশে এ গণতন্ত্রের দোহাই দিয়েই রাতে ভোট, ভোটের পূর্বেই বাক্স ভর্তি করে রাখা ভোট, ডামি ভোট, জাল ভোট, জোট ভোট, টাকার ভোট করে ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতায় টিকে থেকে ফ্যাসিস্ট ও স্বৈরশাসনকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে বিগত ১৬ বছর। সে জন্য গণতন্ত্রকে অনেকেই মোলাঝোলানো ধোঁকাতন্ত্রও বলে থাকেন। রাজনীতিতে গণতন্ত্রের নামে মিথ্যার ফুলঝুরি, ওয়াদার ছড়াছড়ি, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য অন্যান্য দলের সাথে দরাদরি ও ধরাধরি সবই চলে। গণতান্ত্রিক শাসনের আড়ালে দলীয় শাসনের ছত্রছায়ায় চলে ঘুষবাণিজ্য, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি। এসব কারণে সালাফদের অনেক শাইখ প্রচলিত গণতন্ত্রকে ইসলামবিরোধী, হারাম এবং কুফুরী শাসন মনে করে প্রত্যাখ্যান করেন। কেননা এ মতবাদে একজন নেশাখোর, জুয়াড়ী, ব্যাভিচারী ফাসেক দেশদ্রোহীর ভোট একজন দেশপ্রেমিক সৎ, শিক্ষিত দায়িত্বশীল ব্যক্তির ভোটের সমান। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এই শ্রেণির সাথে আপোষ করতে হয় যা ইসলামী আদর্শের পরিপন্থি। ক্ষমতার জন্য অন্যায়ের সাথে আপোষ করাকে তারা কুফুরী বলে মনে করেন। তাদের অনেকের মতে, এ মতের শাসক সমর্থক এবং যারা যারা এ গণতন্ত্র চর্চা করেন তারা সবাই কুফুরিতে নিমজ্জিত। মধ্যমপন্থী অনেক শাইখ প্রচলিত এ গণতন্ত্রকে মন্দের ভালো বিবেচনা করে এর সাথে কাজ করার সমর্থন দিয়ে থাকেন। তাদের মতে, এ পদ্ধতিতে ইসলামী শাসনের পথে জনসমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে এবং ইসলামী সমাজ ও শাসন কায়েমের জন্য নির্বাচণে অংশ নেয়া যেতে পারে যার উদ্দেশ্য হবে রাজনৈতিক দক্ষতা অর্জন ও ইসলামী শাসনের জন্য জনমত সৃষ্টি। এ জন্য প্রচলিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নেয়া দূষণীয় নয়। তাদের মতে, প্রচলিত পদ্ধতিকে পরিহার করে রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে নিজেকে দূরে রেখে প্রকারান্তরে কুফুরী আদর্শকেই স্থায়িত্ব প্রদান করা। বাংলাদেশে বর্তমানে জুলাই-২৪ বিপ্লবের মাধ্যমে যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, ওলামা-মাশাইখদের তা কাজে লাগানো প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। বিরোধপূর্ণ মানসিকতা পরিহার করে আমাদের এই সবুজ বাংলায় কুরআন সুন্নাহর বিধানে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধভাবে সক্রিয় ভূমিকা রাখাই এখনকার সময়ের দাবি।

প্রবন্ধ / المقالة

রাজকীয় মেহমান হিসেবে হজ্জ পালন: অনুপম অনুভূতির লেখচিত্র

আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী❖

পূর্ব প্রকাশিতের পর

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী, মুযদালিফায় কিন্তু আমাদের কঙ্কর সংগ্রহ করতে হয়নি। সম্মানীত পবিত্র নগরীদ্বয়ের খাদেম আমাদের উপহৃত ব্যাগের মধ্যে অন্যান্য জিনিষের সাথে প্যাকেট ভর্তি কঙ্করও সরবরাহ করেছিলেন। মেহমানদের প্রতি তাঁদের অসামান্য ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ আমাদের মস্তক অবনত করে তোলে। উপর্যুপরি দু'দিন আরো ২১টি করে মোট ৪৯টি কঙ্কর নিক্ষেপ করে হোটেল মিলিনিয়ামে ফিরি।

মক্কায় অবস্থানকালে উম্মুলকুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও বাংলাদেশ থেকে আগত হাজীদের সমভিব্যহারে একটি চমৎকার আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের স্নেহভাজন সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মাতিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এটি সম্ভব হয়েছিল। মক্কা মুকাররমায় জমঈয়তের সাংগঠনিক গতি-প্রকৃতি; ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধা বিশেষ দাওয়াতী মেহমান ইত্যকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বজনাব মাওলানা আকরামুজ্জামান, ড. হাফেজ রফিকুল ইসলাম, প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম, ড. মুজাফফর বিন মুহসিন ও অভাজন প্রাবন্ধিক নিজে।

এতদ্ব্যতীত, যৎসামান্য প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে হজ্জ সম্পন্নের বিষয়ে আলোচিত হয়। মক্কা মুকাররমায় ব্যাপক সংস্কার ও পরিছন্নতার উদ্যোগ মুসলিম বিশ্বকে অবাক করে তোলে। বিশেষত বাদশাহ সালমান ও তাঁর পিতার একক অবদান মুসলিম উম্মাহ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম হলো হজ্জ। কুরআনুল কারীমে অন্তত ১০ জায়গায় পরিষ্কারভাবে হজ্জ প্রতিপালনের বিষয়ে উল্লেখ আছে। পবিত্র হজ্জে অশেষ সওয়াব ও কল্যাণ-কামিয়াবীর জন্য অনেক সাহাবী, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন ও সালফে সালেহীনগণ ফরজ হজ্জ আদায় করার পরও বহু হজ্জ করেছেন। তাঁরা দীনের অন্যান্য কাজ যেমন, জেহাদ, ধর্মপ্রচার ইত্যাদি কাজে লিপ্ত থেকে তৎকালীন হজ্জের অতীব কষ্ট সহ্য করে ও মালের কুরবানী করে বার বার হজ্জ করেছেন। একাধিক বার হজ্জ করেছেন বাংলাদেশ জমঈয়তের প্রাণপুরুষ আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরাইশী, তাঁর স্বনামধন্য ভ্রাতুষ্পুত্র ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান শিক্ষা প্রশাসক ও শিক্ষাবিদ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের চার দশককালের কাণ্ডারী প্রফেসর ড. আল্লামা আব্দুল বারী। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, রাব্বে কারীম বলেন : আমি বান্দার শরীর সুস্থ রাখলাম, তার জীবিকায় প্রশস্ততা দিলাম, তারপর পাঁচ বছর গেল এর মধ্যে সে আমার ঘরে হজ্জের উদ্দেশ্য এলো না, তাহলে সে বড়ই হতভাগ্য। অর্থাৎ একাধিকবার। হজ্জ সম্পন্ন করা কতই না সৌভাগ্যের বিষয়।[১৬]

মামলুক সুলতান বাইবার্স সালতানাতের মর্যাদার প্রতীক হিসেবে প্রতিবছর মাহমিল বা মাহমালের[১৭] মাধ্যমে হজ্জ পালনের জন্য লোক পাঠাতেন। কায়রো দামেশক, ইয়েমেন, হায়দারাবাদ, দারফুর এবং তৈমুরী সাম্রাজ্য থেকে হজ্জে পাঠানো হতো। আমরা জানি না, তবে ধারণা এই যে, দুই পবিত্র নগরীর খাদেম বাদশাহ সালমান ওই ধারণা থেকে প্রতি বছর অন্তত ২৫০০-৩০০০ মানুষকে রাজকীয় মেহমান হিসেবে হজ্জ করার সুযোগ দিয়ে থাকেন। রাজকীয় স্টাইলে সমুদয় খরচও বহন করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে রাজকীয়

❖ *ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।*

[১৬] *সহীহ বুখারী হা : ১৭৭৩।*

[১৭] *মাহমাল আরবি শব্দ, অর্থ একটি অনুষ্ঠানিক যাত্রা বা হজ্জের সময় তীর্থযাত্রীদের কাফেলার মধ্যে উটের পিঠে বহন করা হতো।*

ঐতিহ্য ছাড়া ও হজ্জ প্রতিপালনের জন্য সমূদয় খরচ বহন করেন। এতদকারণে বদলি হজ্জের অশেষ সাওয়াব তো আছেই।

বদলী হজ্জ হিসেবে প্রতিপন্ন হলে যার পক্ষ থেকে করা হয় তিনি পূর্ণ হজ্জের নেকি পাবেন।[১৮] সুতরাং এই ধারণায় সিক্ত হয়ে খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন এই উদ্যোগ নিয়ে থাকতে পারেন।

যাইহোক, আমরা সম্মিলতিভাবে বায়তুল্লাহ অভিমুখে রওনা হয়েছিলাম। বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে গিয়ে আমরা আর একত্রে থাকতে পারিনি। প্রচণ্ড ভিড় আবার হাজরে আসওয়াদ পাথর চুম্বন ও মুলতাযাম ধরে প্রার্থনা করার অভিলাস; কোনোভাবেই পরস্পরকে ধরে রাখতে পারিনি। শেষ অবধি আমার সঙ্গী ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম সাহেবকে ছাড়িনি। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী তাওয়াফের এক পর্যায়ে নিয়্যত করে বারগাহে মাওলা আর্জি জানালাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হজরে আসওয়াদ স্পর্শ[১৯] ও মুলতাযাম ধরার[২০] সুযোগ করে দিও। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, এটা আমার বুজুর্গী নয় বরং প্রত্যাশায় উপনীত হওয়ার আকুল আগ্রহের দরুণ আমার মাওলা অনায়াসে আমার জন্য সে সুযোগ অবারিত করে দিয়েছিলেন। নাইজার, সেনেগাল ও আলজেরিয়ানদের ধাক্কায় টিকে থাকা ও পাথর স্পর্শ করা যে কত কঠিন তা আপনারা জানেন। হাজরে আসওয়াদের ডান সংলগ্ন মুলতাযাম তো ঘাম ও বহু স্পর্শের কারণে পিছিল হয়ে আছে, তবু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তা ধরে আর্জি করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

শেষাবধি তাওয়াফে আমরা ৪/৫ জন ছিলাম কিন্তু তাওয়াফের সংখ্যা নিয়ে বাধ সাধলো। আমি গুনেছি ছয় আর অন্য একজন বলেন সাত। অবশেষে ডাক্তার সাহেব আমার সাথে গেলেন, বাকীরা দু'রাকআত নামায পড়ে সাঈ করার জন্য পূর্ব সন্নিকটে সাফা পাহাড়ের দিকে চলে গেলেন। আমরা দু'জনে বাকী একবার তাওয়াফ শেষ করে যথারীতি সাঈ সম্পন্ন করি। এখনও কিন্তু মাথা মুণ্ডন করি নি। ভাবলাম, যেহেতু জুমু'আর দিন, গোসল করা মোস্তাহাব, সে কারণে মাতাফের পশ্চিম-দক্ষিণে গোসল করার জন্য হাম্মামের খোঁজে বের হলাম। প্রচণ্ড রোদ, হাম্মামের খোঁজ নিতে গিয়ে ডাক্তার সাহেব হারিয়ে গেলেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া গেল না। অগত্যায় আমি গোসল শেষ করে জুম'আর নামাযের প্রস্তুতি নিলাম। নামাজ শেষ করে আন্ডারপাশ দিয়ে বায়তুল্লাহর পূর্ব দক্ষিনপাড় হয়ে মূল রাস্তায় উঠি। পথিমধ্যে আমার আহলিয়ার মৃদু বায়না ছিলো 'একটু সোনা নিও'। সামান্য পরিমাণে তা কিনে জোর কদমে মিনার পানে রওনা হলাম। একাই রওনা হয়েছি। ডানে-বামে হাজীদের চলাফেরা আনাগোনা বেশ ভালই লাগছিলো। চৌদ্দশত বছর আগে পাহাড় প্রান্তরে রাস্তা-ঘাট তো ছিলই না চলাফেরা কেমনে হতো? ক্ষুধা-পিপাসার জ্বালা, দুর্গম পথ সব মিলিয়ে বাড়ি ফেরা যাবে কি যাবে না এমনিভাবে মানুষ প্রায় শেষ বয়সে অকর্মন্য হয়ে হজ্জে যেতেন। পুত্র-কণ্যার বিয়ে-শাদী, জমি ভাগ করা ইত্যাদিও বাকী থাকতো না।

আব্বাসীয় খিলাফতের (৭৫০-১২৫৮) মহিমান্বিত খলিফা হারুন অর রশীদের নাম কে না জানে? তাঁর বিদূষী স্ত্রী ছিলেন জুবায়দা। তিনি মক্কার হাজীদের পানি সংকট দূর করার জন্য খাল খনন করেন। ইতিহাসে এটি 'নহরে জুবায়দা' নামে খ্যাত। নহরে জুবায়দা একটি মিষ্টি পানির নহর বা খাল বিশেষ। খালটি সুদূর ইরাকের মসুল নগরীর নু'মান উপত্যকা থেকে উৎসরিত হয়ে তায়েফের পাশ দিয়ে আরাফ ও উরনাহ উপত্যকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মক্কায় এসে পৌঁছেছে। নহরে জোবায়দা খনন করা হয় আজ থেকে অন্যূন ১২০০ বছর আগে। যাহোক, সে সময় আরবের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না; সেক্ষেত্রে তাদের পক্ষে অন্যদের সহযোগিতার প্রশ্নই

---

[১৮] *ফাতাওয়া লাজনা আদ--দায়েমা, ১১তম খণ্ড পৃ. ৭৮।*

[১৯] *বাংলায় কালো পাথর। পাথরটি কাবার দক্ষিণপূর্ব কোনো মাতাফ থেকে দেড় মিটার উঁচুতে অবস্থিত। পাথরটি আদম আলাইহিস সালাম হাওয়া আলাইহিস সালাম-এর সময় বেহেশত থেকে পৃথিবীতে এসে পড়ে। প্রাক-ইসলামি পৌত্তলিক সমাজেও এ পাথরকে সম্মান করা হতো।*

[২০] *মুলতাযাম হলো কাবা ঘরের হাজরে আসওয়াদ থেকে দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত দেয়ালের একটি বিশেষ স্থান। এটি দু'আ কবুলের স্থান হিসেবে পরিচিত। পুণ্যার্থী হাজীগণ এখানে এসে আল্লাহর কাছে বিভিন্ন বিষয়ে মিনতি ও প্রার্থনা করে থাকেন।*

আসে না। তবে আল্লাহর নবীর ﷺ দু'আর প্রতিফলন অব্যাহত ছিল। ছিল প্রচুর বরকত। এখনো তা অব্যাহত আছে। দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গার উৎপাদিত ফলমূলের সমাহার অবাক করার মতো। উট, দুম্বা ও ছাগলের বিস্তীর্ণ চারণভূমি। অথচ ঘাসতো সর্বত্র দেখা যায় না।

একবার মক্কার গেট অতিক্রম করে মদীনার পানে রওনা হয়েছি। হঠাৎ দেখি বামদিকে সাদা-সাদা কী যেন বিশাল এলাকা নিয়ে ঢেউ খেলছে। পরে চোখ কচলে ঠাহর করলাম এতো দেখছি ভেড়ার পাল! নাকি দুম্বা পার্থক্য সম্ভবত সাইজে। বৃষ্টি হয়না। লু হাওয়ার উপদ্রব। তথাপি দুম্বা ও উটের গায়ের লোম যেন কে বা কারা এখনই ধুয়ে দিলেন। দুগ্ধ ফেননিভ দুম্বার লোম আমাকে সাত্যিই চমৎকৃত করেছিলো।

সম্ভবত বছর বাইশেক আগের কথা। আমার প্রতিপালক আমাকে তার ঘর তাওয়াফ করার জন্য মঞ্জুর করেছিলেন। সাথে ছিলেন আমার মমতাময়ী মা। ২০০১ সালে আমার পরম শ্রদ্ধার ধন বাবাকে হারিয়েছিলাম। সেই শোকে মুহ্যমান হয়ে কতকটা প্রশমনের জন্য ও ফরজিয়াত আদায়ের লক্ষ্যে মাতা-পুত্রের হজ্জ যাত্রা ছিল। সেবারের একটা চমকপ্রদ ঘটনা। সম্ভবত রাখালটা পাকিস্তানি হবে। স্থানীয় বাজারে ছাগল-দুম্বা কিনে হাজীদের কাছে কুরবানীর জন্য বিক্রি করে থাকেন। দেখলাম একটা ছাগল পাল থেকে দৌড়ে তরতর করে পাহাড়ের ওপর উঠে গেল। সুউচ্চ পাহাড়ের ওপর উঠে ছাগলটি যেন লুকোচুরি খেলা শুরু করেছে। রাখালটি ধরতেই পারছে না। ফাঁকে ফাঁকে ছাগলটি যেন পাহাড়ের গা চেটে ক্ষুধা নিবারণ করছে। কষ্টকর পাহাড়ের পাথর ও কাঁটা যেন তাদের আহার। শ্রষ্ঠার কী আশ্চর্য ব্যবস্থাপনা! মনে হলো না যে সে ছাগলটি উদ্ধার করতে পেরেছে। চতুষ্পদ এ সকল জন্তু কি খায়? অথচ নাদুস-নুদুস চেহারা। তাইতো মনে হয় সুরা আর রহমানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্তত ৩১ বার فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ অর্থাৎ তোমাদের রবের কোন নেয়ামতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে।

আলোচনার অনুষঙ্গ হিসেবে ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণায় আমরা প্রায় খেই হারিয়ে ফেলার উপক্রম। তবুও যা লিখছিলাম, ডানে-বামে পাহাড়, আবার ভেদ করে সুদৃশ্য আণ্ডারপাশ আমাদের বিস্মিত করে তুলেছিলো। দ্রুতপদে হাঁটছি। বায়ে দেখি সম্ভবত নাইজেরিয়ান কৃষ্ণকায় কিন্তু ঈমানী তেজে দারুণভাবে বলীয়ান একটি মহিলাও হাঁটছে। শখ হলো ওর ছবি তুলবো। ছবি তোলার প্রস্তাব দেওয়াতে মুচকি হেসে সম্মতি দিলেন। নিতান্তই কাঁচা হাতে ছবিটি তুললাম। দ্রুতপদে, মাথায় পুঁটলী নিয়ে পথ অতিক্রমের ব্যঞ্জনা আমাকে ভাবিয়ে তুললো। পোশাক-আশাকে অতীব সাধারণ অথচ নাবী ﷺ-এর সুন্নতকে মেনে চলার তীব্র আকাঙ্ক্ষার ঈর্ষণীয় প্রতিফলন আমাকে অবাক করেছে। আল্লাহর হুকুম হজ্জ প্রতিপালনের আগ্রহ ও তা পালনে সুন্নতের পাবন্দীতে মহিলাটির ঐকান্তিকতা সত্যিই মুগ্ধ করার মতো।❑❑

গ্রাহক হওয়ার আহ্বান

"মাসিক তর্জুমানুল হাদীস"

পত্রিকার গ্রাহক/এজেন্ট হতে আগ্রহীদের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা গ্রাহক ফি ৩৬০/- (তিনশত ষাট টাকা) প্রেরণসহ। যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

যোগাযোগ :

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
মোবাইল : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮
বিকাশ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

পিডিএফ ফাইল পেতে নিম্নে ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

ফেসবুক পেইজ
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

ওয়েবসাইট
http://www.jamiyat.org.bd/

সালাফী আলেম-ওলামার প্রতি আল্লামা রাবী' (রহমাহুল্লাহি আলাইহি)-এর বিশেষ ওসিয়ত

মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ বিন আব্দুল জলীল।*

সকল সাধারণ মুসলিম ভাই-বোন, ইসলামি জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত ছাত্র, বিশেষ করে আলেম-ওলামা এবং তার চেয়েও বেশি করে সালাফি আলেমদের জন্য শাইখ আল্লামা রাবী ইবন হাদী উমাইর আল-মাদখালীর (রহমাহুল্লাহি আলাইহি)-এর এই ওসিয়ত বা এক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশমালা। এটি প্রতিটি মুসলিমের জন্য এক অমূল্য দিকনির্দেশনা, বিশেষত বর্তমান ফিতনার যুগে দ্বীনের ওপর দৃঢ় থাকার জন্য।

নিম্নে মরহুম শাইখ, আল্লামা রাবী ইবন হাদী উমাইর আল-মাদখালীর (রহমাহুল্লাহি আলাইহি) ওসিয়তনামাটির অনুবাদ উপস্থাপন করা হলো : শাইখ আল্লামা রাবী ইবন হাদী উমাইর আল-মাদখালীর (রহমাহুল্লাহি আলাইহি) ওসিয়ত :

ইন্তিকাল : ১৫ই মুহাররম, ১৪৪৭ হিজরী বুধবার রাতে।

জানাজা : বৃহস্পতিবার ফজরে মসজিদে নববীতে।

দাফন : বাকি গোরস্তানে কবর দেওয়া হয়।[২১]

(আল্লাহ তাঁকে রহম করুন এবং জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করুন)

إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

আলহামদু-লিল্লাহ। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর সাহায্য চাই, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমাদের আত্মার মন্দতা ও কাজের কুৎসিততা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, তাকে কেউ বিপথে নিতে পারে না। আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন, তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমনভাবে ভয় করা উচিত, তেমনভাবে ভয় করো এবং মৃত্যুবরণ করো না ইসলামের ওপর থাকাবস্থায় ছাড়া।"[২২]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

"হে মানবজাতি! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই তাঁর সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন এবং উভয় থেকে অনেক পুরুষ ও নারীকে বিস্তৃত করেছেন এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে কিছু চাও এবং (ভয় করো) আত্মীয়তার সম্পর্ক বিষয়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন।"[২৩]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। আল্লাহ তোমাদের কাজগুলোকে সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে নিশ্চিতভাবে মহান সাফল্য অর্জন করবে।"[২৪]

এরপর বলি : নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কথা আল্লাহর কিতাব, এবং সর্বোত্তম পথনির্দেশ মুহাম্মাদ ﷺ-এর পথ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো নতুন উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ, প্রতিটি নতুন উদ্ভাবন হলো বিদ'আত, প্রতিটি বিদ'আত হলো গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী আগুনে নিয়ে যায়।

---

* *শিক্ষার্থী, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় (মাস্টার্স), মসজিদে নববীর অনুবাদক এবং মুতুন বিভাগের শিক্ষক।*

[২১] *আমাদের দেশে এটাকে অনেকে জান্নাতুল বাকী নামে চিনে থাকেন কিন্তু এটা সঠিক নয়। ওখানে অনেক সাহাবী ও মুনাফিকের কবর আছে। জান্নাতুল বাকি বলাটা সঠিক নয়।*

[২২] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১০২।*

[২৩] *সূরা আন-নিসা আয়াত : ১।*

[২৪] *সূরা আল-আহযাব আয়াত : ৭০-৭১।*

সাধারণ মুসলিমদের উদ্দেশ্যে এই অসহায় এক বান্দার ওসিয়ত: আমি, এক অসহায় বান্দা - যিনি এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার দ্বারপ্রান্তে এবং আখিরাতের দিকে গমনরত- সাধারণ মুসলিমদের প্রতি ওসিয়ত করছি যে, তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো। তাঁর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, বিভক্ত হয়ো না, দ্বীনের মধ্যে দলাদলি কোরো না।

আল্লাহভীতি ও কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা হলো দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্যের চাবিকাঠি। এতেই দুনিয়া ও আখিরাতে মুসলমানদের প্রকৃত সফলতা ও মর্যাদা নিহিত। আর বিভেদ ও মতানৈক্য হল অপমান ও পরাজয়ের মূল কারণ। কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া একতাবদ্ধ হওয়ার কোনো পথ নেই।

তাই মুসলমানদের উচিত এই মহান উপায়টি আঁকড়ে ধরা- যা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ ও সৌভাগ্য বয়ে আনে, এবং এমন সমস্ত কিছু থেকে দূরে থাকা-যা এর বিপরীত, অর্থাৎ মতভেদ ও বিভক্তি, যা দুনিয়া ও আখিরাতে দুর্দশা ও অপমানের মূল কারণ।

বিশেষ করে সালাফী ভাইদের প্রতি আমার ওসিয়ত : তোমরা যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার ও তার দিকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে অনন্য, সুতরাং তোমাদের উচিত-মুসলিমদের আকীদা, ইবাদত, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি সবদিক সংশোধনে দ্বিগুণ পরিশ্রম করা, যাতে সব কিছুই কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিমদের নিকট এই উদ্দেশ্যগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরো এবং বুঝিয়ে দাও যে, তোমরা এই উম্মতের জন্য শুধুই কল্যাণ চাও, কোনো ক্ষতি নয়।

আর আমি আহ্বান করছি : যারা আলেম, যারা ছাত্র, যাদের বিভিন্ন দল-মত আছে- সবাইকে বলছি, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, এই উম্মতের প্রতি দয়া করো, এবং সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করো এই উম্মতকে কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফে সালেহীনের মানহাজে ফিরিয়ে নিতে- আকীদা, ইবাদত, রাজনীতি, নৈতিকতা সবদিক দিয়ে। নিজস্ব খেয়াল ও মতানৈক্য থেকে দূরে থাকো। এখনই সময় নিজেদের সংশোধনের এবং জাতিকে অধঃপতন থেকে বাঁচানোর।

স্মরণে রাখো : এই উম্মত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে- এ কারণে যে, তাদেরকে মানুষদের কল্যাণে পাঠানো হয়েছে, সৎ কাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে।

এবং এই শ্রেষ্ঠত্ব সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের অনুসারীদের জন্য রাসূল ﷺ নিজেই স্বীকৃতি দিয়েছেন:

خير الناس قرني ثم الدين يلونه ثم الذين يلونهم، ثـم يـأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويكثر فيهم السمن .

"মানুষদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো আমার যুগ, তারপর তার পরের যুগ, তারপর তাদের পরের যুগ..."[২৫]

আর তিনি ﷺ বলেছেন :

يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة -أو حثالـة- كحفالة الشعير والتمر لا يباليهم الله بالة.

"এক এক করে নেক লোকেরা চলে যাবে। অবশেষে এমন কিছু লোক থাকবে যারা গম-খোসার মতো, খেজুরের আবর্জনার মতো, আল্লাহ তাদের কোনো গুরুত্ব দেবেন না।"[২৬]

অতএব, আলেমদের উচিত- আল্লাহর জন্য, কুরআনের জন্য, রাসূলের জন্য, সাধারণ ও বিশেষ মুসলিমদের জন্য আন্তরিকভাবে উপদেশ দেয়া।

যাতে করে আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলিমরা অবমূল্যায়ন ও অপমানের এই অবস্থা থেকে মুক্তি পায়। কারণ মূলত কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিচ্যুতি এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণই এই অবনতির প্রধান কারণ।

যদি তারা আন্তরিকভাবে ফিরে আসে, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক কল্যাণ আসবে।

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, যেন তিনি মুসলিমদের জন্য কল্যাণমূলক এই বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করেন এবং মুসলিমদের থেকে বিভক্তি, হিংসা, শত্রুতা ও বিদ্বেষ দূর করে দেন-এ সবই হলো জাতির পতনের কারণ।

লিখেছেন তাঁর শিষ্য ও পুত্র খালিদ ইবন দুহাইয়ি আয-যাফীরী, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন এটি সকল জায়গায় - পত্রিকা ও অন্যান্য মাধ্যমে - প্রচার করা হয়।

লিখে দিয়েছেন রাবী ইবন হাদী আল-মাদখালী

২৫ই জিলহজ্জ, ১৪২০ হিজরী বৃহস্পতিবার বিকেলে।

اللّٰهُمَّ اغفر له وارحمه، وأسكنه فسيح جناتـك، وأجـزه عـن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

---

[২৫] *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*
[২৬] *সহীহ বুখারী।*

শাইখ ডক্টর রাবী' বিন হাদী উমায়ের আল-মাদখালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) : আপোষহীন এক সালাফী বিদ্বান।

সংকলক : শাইখ আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল ফারুক*

বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সালাফী বিদ্বান, যিনি একাধারে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ এবং আকীদার ইমাম। বিশেষ করে, হাল যামানার বিভিন্ন প্রথভ্রষ্ট দল ও মতাদর্শের দলীলভিত্তিক জবাব প্রদান এবং জাতির কাণ্ডারী হিসেবে তিনি এমন এক সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত, যা প্রায় সকলের জন্যই অধরা স্বপ্ন। খুব সম্প্রতি এমন মহান পথপ্রদর্শকের প্রস্থান, উম্মাহর জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, আর উম্মাহর জন্য তাঁর বিকল্প প্রস্তুত করুন।

আমরা খুব সংক্ষেপে এই মহান ইমামের বর্ণাঢ্য জীবনের যৎসামান্য তুলে ধরার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب .

নাম ও বংশ : তাঁর নাম; রাবী', বাবার নাম; হাদী।

পুরো নাম : আল-আল্লামা, আল-ইমাম, আল-মুহাদ্দিস, আশ-শাইখ রাবী' বিন হাদী বিন মুহাম্মাদ বিন রাবী' উমায়ের আল-মাদখালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

তিনি "হাসান বিন আলী বিন আবী ত্বালীব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর বংশধর"।[২৭]

জন্ম ও শৈশব : শাইখ রাবী' বিন হাদী আল-মাদখালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ১৩৫১ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৩ সালে, সৌদী আরবের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ "জিযান" এর "সামিতাহ্" শহরের অন্তর্গত "জারাদিয়্যাহ্" নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

দেড় বছর বয়সে বাবা হাদী বিন মুহাম্মাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে হারান। ইয়াতীম অবস্থায় মাতা "লায়লা" (রহমাতুল্লাহি আলাইহা)-এর নিকট লালিত পালিত হন। সার্বিক দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন চাচা ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)। মা লায়লা ছিলেন অত্যন্ত বিদূষী এবং পরহেযগার এক মহান নারী, যিনি সন্তানকে খুব ছোট্ট থেকেই দ্বীনি ইলম, উত্তম আখলাক, সত্যবাদিতা আর আমানতদারিতার ওপর গড়ে তুলেন।

শাইখের একজন সহোদর ভাই ছিল, নাম আহমাদ। তিনি পরিবার দেখাশোনা এবং চাষাবাদ করতেন, আর শাইখ জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত ছিলেন। তার ভাই ১৩৮৩ হিজরীতে তাঁর মহান রবের সান্নিধ্যে চলে যান।[২৮]

জ্ঞানার্জন : শাইখ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যেমন প্রচন্ড মেধাবী ছিলেন, ঠিক তদ্রূপ জ্ঞানার্জনে ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহী এবং পরিশ্রমী। আট বছর বয়সে গ্রামের মক্তবে ভর্তি হন। সেখানে তিনি সুপ্রসিদ্ধ শাইখ মুহাম্মাদ শায়বান উরায়সী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর নিকট আরবী পড়া এবং হাতের লেখা আত্মস্থ করেন।

তাঁর বর্ণাঢ্য শিক্ষাজীবনকে খুব সংক্ষেপে পয়েন্ট আকারে উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ।

(ক) শাইখ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর জীবনে সর্বাধিক প্রভাব ফেলেছিলেন, তদানীন্তন যুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ সালাফী বিদ্বান, শাইখ আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমদ আল-ক্বরআবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)। যিনি "জিযান" অঞ্চলের বিচারক ছিলেন। তিনি ধৈর্য, সহনশীলতা, জ্ঞান, হিকমাহ আর কোমলতা দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন। কঠোরতার পন্থা পরিহার করেছিলেন।

ফলে তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পবিত্র মক্কা থেকে ইয়ামেন এবং নাজরান পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলকে শিরক, বিদ'আত এবং জাহালাতের অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হন।

ধৈর্য, সহনশীলতা, জ্ঞান, হিকমাহ আর কোমলতায় বহু তাঁর মতোই ছিলেন তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্র, তৎকালীন যুগের

---

* অনার্স, (হাদিস) মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মদিনা , সৌদী আরব।

[২৭] আল-ফুসূল আল-মুদিয়্যাহ্ মিন সিরাতিশ শাইখ রাবী' বিন হাদী আল-মাদখালী, পৃষ্ঠা নং ১৭-১৮।

[২৮] আল-ফুসূল আল-মুদিয়্যাহ্ মিন সিরাতিশ শাইখ রাবী' বিন হাদী আল-মাদখালী, পৃষ্ঠা নং ২৩।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্বান শাইখ হাফেয আল-হিকামী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)। তারা দু'জন কখনোই পৃথক হতেন না।[২৯]

শাইখ রাবী' বিন হাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) শাইখ হাফেয আল-হিকামী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর নিকট দীর্ঘদিন অধ্যয়ন করেছেন। তবে, তিনি শাইখ আব্দুল্লাহ ক্বরআবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন ছোট বয়সে এবং তিনি তাকে বেশ কিছু হাদীস লিখে দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি তাঁর নিকট ইলমুল ফারায়েজের কিছু অংশ পড়েছেন।

যেমনটি তিনি বলেন :

القرعاوي جلست عليه صغيرا جدا، وكتب لي في بداية الأصول الثلاثة .

আমি খুব ছোট্ট বয়সে শাইখ ক্বরআবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর দারসে বসেছি, তিনি আমাকে "উসূলে সালাসা" গ্রন্থের শুরু অংশ লিখে দিয়েছেন।[৩০]

তবে, শাইখ ক্বরআবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর শেষ বয়সে এসে শাইখ রাবী' তাঁর সাথে জীবনের প্রথম হজ্জ করার সুযোগ লাভ করছিলেন।

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষা : মাদ্রাসা সালাফিয়্যাহ, সামিতাহ্, জিযান, সৌদী আরব।

শাইখ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর জীবনে উক্ত মাদ্রাসার অবদান ব্যাপক।

সৌদী আরব প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নেই বাদশাহ আব্দুল আযীয (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর তত্ত্বাবধানে উক্ত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যেখানে শ্রম দিয়েছেন আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-ক্বরআবী, শাইখ হাফেয আল-হিকামী, নাসের খলূফা ত্বয়্যাশসহ যুগশ্রেষ্ঠ বিদ্বানগণ।

উক্ত মাদ্রাসায় অধ্যয়ন এবং যাবতীয় খরচ সম্পূর্ণ ফ্রি ছিল, যার সকল খরচ বহন করতেন জিযান প্রদেশের আমীর খালিদ বিন আহমাদ আস-সুদাইরী, সরাসরী তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে।

উক্ত মাদ্রাসায় তিনি একাধারে আট বছর বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অধ্যয়ন করেন।

(গ) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা : সুদীর্ঘ আট বছর, মাদ্রাসা সালাফিয়্যাহতে অধ্যয়নের পর তিনি "সামিতাহ" জেলার "আল-মা'হাদ আল-ইলমী" তে ভর্তি হন। এই ইসলামিক ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল ছিলেন আল্লামা শাইখ হাফেয আল-হিকামী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)। তৎকালীন যুগে এটাকে সৌদী আরবের দ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ বিবেচনা করা হত, যা ১৩৭৪ হিজরীতে স্বয়ং বাদশাহ সউদ বিন আব্দুল আযীয (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রতিষ্ঠা করছিলেন।

এখানে তিনি একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়ন করেন।

শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন;

১. আল্লামা হাফেয বিন আহমাদ আল-হিকামী।

২. আল্লামা মুহাম্মাদ বিন আহমদ আল-হিকামী।

৩. আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আন-নাজমী।

৪. আল্লামা মুহাম্মাদ আমান আল-জামী, প্রমুখ প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণকে।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন : আল-মা'হাদ আল-ইলমী থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর তিনি ১৩৮১ হিজরীতে সৌদী আরবের রাজধানী রিয়াদস্থ রিয়াদ কলেজ (বর্তমান নাম : ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)-এ কুল্লিয়্যাতুশ শারীয়াহতে ভর্তি হন। সেখানে তিনি শাইখ বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

অধ্যয়নের তিন মাসের মাথায় "মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা লাভ করলে তিনি কালবিলম্ব না করে রিয়াদ থেকে বিমান যোগে মদীনা আগমন করে সেখানে ভর্তি হন এবং ৬ই রবিউল আওয়াল ১৩৮১ হিজরী মোতাবেক ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে "মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়"-এর প্রথম দারসে অংশগ্রহণ করেন। ১৩৮৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি তামাম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ, মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুমতায (এক্সিল্যান্ট) মার্ক নিয়ে লিসান্স (অনার্স) সমাপ্ত করেন।

মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাদের নিকট অধ্যয়ন করেছেন;

[২৯] *আল-ফুসূল আল-মুদিয়্যাহ্ মিন সিরাতিশ শাইখ রাবী' বিন হাদী আল-মাদখালী, পৃষ্ঠা নং ২৬।*

[৩০] *তাযকীরুন নাবিহীন, পৃষ্ঠা নং ৩৩৯-৩৪৩।*

১. শাইখ আল্লামা আব্দুল আযীয ইবনে বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

২. শাইখ আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

৩. শাইখ আল্লামা মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

৪. শাইখ আল্লামা আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ হাফিযাহুল্লাহ।

৫. শাইখ আল্লামা হাম্মাদ আল-আনসারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

৬. শাইখ আল্লামা হামূদ আত-তুওয়াইজিরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

৭. শাইখ আব্দুল গাফ্ফার বিন হাসান হিন্দী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বানগণের নিকট।

বর্ণাঢ্য কর্মজীবন :

(ক) শাইখ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের পর, ১৩৮৬ হিজরীর ২১ জুমাদাল উলা, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত উচ্চ মাধ্যমিক (আল-মা'হাদ আস-সানূবী)-এর শিক্ষক নির্বাচিত হন। খুব সামান্য সময় শিক্ষকতার পরেই শাইখ বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর ডাক চলে আসে।[৩১]

(খ) শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ভারত গমণ :

শাইখ বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তখন মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। তিনি তাঁকে এবং তাঁর নিজের সহপাঠী শাইখ সালেহ আল-ইরাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে, ১৩৮৬ হিজরীর শেষের দিকে অথবা ১৩৮৭ হিজরীর শুরুর দিকে, ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বানারস শহরে অবস্থিত, আহলুল হাদীসগণের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ "জামিআ সালাফিয়্যাহ, বানারস"-এ শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেন।

শাইখদ্বয় শিক্ষা ও দাওয়াহ্-এর মাঠে ব্যাপক অবদান রাখেন। বিশেষ করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসে বিরাট পরিবর্তন আনেন।

যেমন, ইতঃপূর্বে সেখানে আকীদার গ্রন্থ হিসেবে "শারহুল আকাঈদ আন-নাসাফিয়্যাহ" পড়ানো হত। তারা এটা পরিবর্তন করে "আল-আকীদা আল-ওসাতিয়্যাহ" এবং "কিতাবুত তাওহীদ" চালু করেন।

এমনকি তারা সেখানকার বেশ কিছু বিদ'আতী কর্মকাণ্ড উৎখাত করেন।

যেমন; "জামিআ সালাফিয়্যাহ বানারস"-এর নামে কোর্টে মামলা ছিল, যখনই এজলাস বসত, ছাত্ররা সহীহুল বুখারীর খতম পড়া শুরু করত। এর প্রতিরোধকল্পে তিনি পাঁচ দিন ক্লাস বন্ধ রাখেন এবং তাদের বুঝাতে সক্ষম হন।

তাদের এই সংস্কার কার্যক্রমে ভারত ও পাকিস্তানের অন্যান্য আহলুল হাদীস প্রতিষ্ঠানেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়।[৩২]

শাইখ রাবী' (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বানারসে তিন বছর অবস্থান করেন। শুধুমাত্র গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি ফিরতেন।

ছাত্ররা তাঁর জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকত। তাঁর দারস, শব্দ চয়ন আর সাহিত্যিক পাঠদান তাদেরকে চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থাকতে বাধ্য করত। তাঁর আখলাক আর বিনয় তাদেরকে বিমোহিত করত।

বিশুদ্ধ আকীদার প্রশ্নে তিনি ছিলেন অনড় ও আপোষহীন।

তাঁর অন্যতম ছাত্র প্রফেসর উবাইদুল্লাহ সালাফী বলেন;

"শাইখ রাবী' (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আমাদেরকে সর্বদায় বিশুদ্ধ আকীদা এবং কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার নাসিহাহ করতেন। আর আমরা স্পষ্ট করেই বলতে পারি যে, বিশুদ্ধ আকীদা আমরা তাঁর নিকট থেকেই শিখেছি। শাইখ দাওয়াতি কাজে অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। একদা তিনি দেখলেন যে, জনৈক ব্যক্তি গলায় তাবীজ ঝুলিয়ে চলছে তিনি তাকে দাঁড় করিয়ে বুঝালেন, নাসিহাহ করলেন। কিন্তু সে তাঁর কিছুই বুঝলো না। এরপর তিনি তাকে মাদ্রাসায় আনলেন এবং একজন দোভাষীর মাধ্যমে বুঝালেন। সর্বশেষ তাবীজ টান দিয়ে ধরলেন এবং কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন।"[৩৩]

---

[৩১] *আল-ফুসূল আল-মুদিয়্যা মিন সিরাতিশ শাইখ রাবী' বিন হাদী আল-মাদখালী, পৃষ্ঠা নং ৫১।*

[৩২] *আল-ফুসূল আল-মুদিয়্যা মিন সিরাতিশ শাইখ রাবী' বিন হাদী আল-মাদখালী, পৃষ্ঠা নং ৫১- ৫৩।*

[৩৩] *আল-ফুসূল আল-মুদিয়্যা মিন সিরাতিশ শাইখ রাবী' বিন হাদী আল-*

(গ) ভারত থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন : শাইখ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ১৩৯০ হিজরী সনে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পুনরায় "আল-মা'হাদ আস-সানূবী" তে অধ্যাপনা শুরু করেন।

এরপর ১৩৯২ হিজরী সনে তিনি "কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়" মক্কা শাখায় "কিসমুস সুন্নাহ"তে মাস্টার্স ও এম ফিল করার সুযোগ লাভ করেন এবং ভর্তি হন।

তিনি ১৩৯৬ হিজরী সনে মাস্টার্স ও এম ফিল সম্পন্ন করেন।

তার এম ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় ছিল;

بين الإمامين مسلم والدراقطني .

১৪০২ হিজরী সনে থিসিসটি "জামিআ সালাফিয়্যাহ বানারস" থেকে প্রথম প্রকাশ পায়।

১৩৯৭ হিজরী সনে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রির সুযোগ লাভ করেন। ১৪০০ হিজরী সনে তিনি এক্সিল্যান্ট মার্ক নিয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। তাঁর ডক্টরেট থিসিস পেপারের বিষয় ছিল;

النكت على كتاب ابن الصلاح، للحافظ ابن حجر رحمه الله .

মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় সর্বপ্রথম দুই খণ্ডে তাঁর থিসিস পেপার প্রকাশ করে।

(ঘ) মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা : ১৪০০ হিজরী সনে সম্মানজনক পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করার পরপরই মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সুযোগ লাভ করেন। তিনি "হাদীস এবং উলুমুল হাদীস"-এর শিক্ষক হিসেবে অধ্যাপনা শুরু করেন। এরপর তিনি হাদীস ফ্যাকাল্টির কিসমুস সুন্নাহ তথা সুন্নাহ অনুষদ-এর দিরাসা উলয়া তথা উচ্চতর গবেষণা (মাস্টার্স, এম ফিল ও পিএইচডি লেভেল)-এর একাধিক সেশনে রাঈস তথা প্রধান নিযুক্ত হন। অনেক থিসিস পেপারের মুনাকিশ তথা থিসিস পর্যালোক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অনেক ছাত্রের থিসিস পেপারের সুপারভাইজার ছিলেন। এছাড়াও তিনি অসংখ্য গবেষণা প্রকাশ করেছেন এবং অসংখ্য পাণ্ডুলিপি তাহক্বীক্ব করেছেন।

সর্বশেষ তিনি ১৪১৮ হিজরীর পহেলা রজব, খ্রিস্টাব্দ ১৯৯৭ সালে উচ্চতর শিক্ষা বিভাগের হাদীস ডিপার্টমেন্ট-এর প্রধান পদে থেকে অবসর লাভ করেন।

রচনাবলী : শাইখ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর এই বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে, ব্যস্ততার মাঝেও অত্যন্ত মূল্যবান অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তন্মধ্যে এমফিল ও পিএইচডি থিসিস পেপার ছিল অত্যন্ত মূল্যবান।

আমরা তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীকে বিষয়ভিত্তিক উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ

(ক) হাদীস এবং উলুমুল হাদীস বিষয়ক :

১. বায়নাল ইমামায়নি মুসলিম ওয়াদ-দারাকুৎনী। (এম ফিল থিসিস পেপার)

২. আন-নূকাতু আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ্, লিল হাফিয ইবন হাজার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)। (পিএইচডি থিসিস পেপার)।

৩. তাক্বসীমুল হাদীস ইলা সহীহ ওয়া হাসান, ওয়া জঈফ, বায়না ওয়াকীঈল মুহাদ্দিসীন ওয়া মুগালাত্বাতিল মুআস্সীবিন। (আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ এবং মুহাম্মাদ আওয়ামাহ-এর হাদীসের নামে বিভ্রান্তির জবাবে রচিত)

৪. মানহাজুল ইমাম মুসলিম ফিল তারতীবি সহীহিহ্।

৫. তাহক্বীকু কিতাব আল-মাদখাল ইলাস সহীহ লিল হাকিম নায়সাবুরী। (১৪০৪ হিজরী সনে মুদ্রিত হয়)।

৬. মুযাক্কিরাতুন ফিল হাদীসিন নবাবী।

খ) আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত :

মাদখালী, পৃষ্ঠা নং ৫৩।

১. তাহক্বীকু কিতাব "ক্বায়েদাতুন জালিয়্যাহ্ ফিত তাওয়াস্সুলি ওয়াল ওসিলাহ্," লি-শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্। (১৪০৯ হিজরী সনে মুদ্রিত হয়)।

২. মানহাজুল আম্বিয়া ফিদ-দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ, ফীহিল-হিকমাহ ওয়াল-আকল। (শাইখ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কর্তৃক রচিত এটি প্রথম গ্রন্থ। যা প্রকাশিত হবার পরপরই তামাম বিশ্বে জাগরণ তৈরি করে। এটি একটি কালজয়ী গ্রন্থ। মূলতঃ ইখওয়ানুল মুসলিমীন তথা মুসলিম ব্রাদারহুড-এর বিভ্রান্তিকর আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের জবাবে এই গ্রন্থ রচিত।)

৩. বারাআতুস সাহাবা আল-আখয়ার, মিনাত্-তাবার্রুকি বিল-আমাকীনি ওয়াল আসার।

৪. হুজ্জিয়াতু খাবরিল আহাদ ফিল আকাঈদ ওয়াল আহকাম। (খবরে ওহেদ হাদীস দ্বারা আকীদা-বিশ্বাস এবং বিধি-বিধান সাব্যস্ত হয়, সেটা তিনি প্রমাণ করেছেন।)

(গ) হক্বপন্থী জামা'আত এবং বিভিন্ন বাতিল ফেরকা সংক্রান্ত :

১. মানহাজু আহলিস সুন্নাহ ফি নাক্বদির রিজাল, ওয়াল কুতুব, ওয়াত-তাওয়াইফ।

২. কাশফু মাওয়াক্বিফিল গাযালী মিনাস সুন্নাহ ওয়া আহলিহা।

৩. মাকানাতু আহলিল হাদীস।

(ঘ) বিভিন্ন ফেরকা ও ব্যক্তির বিভ্রান্তির জবাবে রচিত:

১. আদওয়াউ ইসলামিয়্যাহ্ আলা আকীদাতি সায়্যেদ কুতুব ওয়া ফিকরীহ্।

২. মাত্বাঈনু সায়্যেদ কুতুব ফি আসহাবি রাসূলিল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন)

৩. আল-আওয়াছিম মিম্মা ফি কুতুবি সায়্যেদ কুতুব মিনাল কাওয়াসীম। (এই তিনটি গ্রন্থ মুসলিম ব্রাদারহুড-এর অন্যতম নেতা সায়্যেদ কুতুবের বিভ্রান্তির জবাবে রচিত।)

৪. আহলুল হাদীস হুম আত্ব-য়িফা আল-মানসুরাহ্ আন-নাজিয়াহ (আহলুল হাদীসরাই মুক্তিপ্রাপ্ত সাহায্যপ্রাপ্ত দল। এই গ্রন্থটি তিনি সালমান আওদাহ-এর বিভ্রান্তির জবাবে রচনা করেন।)

৫. আল-হাদ্দুল ফাসিল বায়নাল হাক্কি ওয়াল বাতিল। (বাকর আবু যায়দ-এর জবাবে রচিত)।

৬. আল-মাহাজ্জাতুল বায়দা ফি হেমায়াতিস সুন্নাহ আল-গর্রাহ।

৭. দাহদু আবাত্বীলি মূসা আদ-দাবীশ।

বিবিধ বিষয়ে রচিত :

১. স্বদ্দু উদওয়ানুল মুলহীদিন ওয়া হুকমুল ইস্তেআনা বিগইরিল মুসলিমীন।

২. আল-কিতাবু ওয়াস সুন্নাহ আছারুহুমা ওয়া মাকানাতুহুমা।

৩. আন-নাসিহাহ্।

এর বাইরেও তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখতেন। বহু কিতাবের তাহক্বীক্ব করেছেন।

মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা জীবনে তিনি অনেক থিসিস পেপার-এর সুপারভাইজার ছিলেন এবং অসংখ্য থিসিস পেপার-এর মুনাকিশ ছিলেন।

আল-ফুসূল আল-মুদিয়্যাহ্ মিন সিরাতিশ শাইখ রাবী' বিন হাদী আল-মাদখালী গ্রন্থের লেখক তাঁর বিশেষ ছাত্র ডক্টর খালেদ জুফাইরী হাফিযাহুল্লাহ, ১৭টি থিসিস পেপার-এর নাম উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর তিনি সুপারভাইজার ছিলেন।

এবং ২২ থিসিস পেপার-এর নাম উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর তিনি মুনাকিশ বা পর্যালোচক ছিলেন।[৩৪]

ছাত্রবৃন্দ : শাইখ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (১৯৩৩-২০২৫) সুদীর্ঘ ৯২ বছরে অসংখ্য অগণিত অজস্র ছাত্র নিজ হাতে গড়েছেন। তাঁর বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ ছাত্রের তালিকা অনেক দীর্ঘ, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন;

[৩৪] *আল-ফুসূল আল-মুদিয়্যাহ্ মিন সিরাতিশ শাইখ রাবী' বিন হাদী আল-মাদখালী, পৃষ্ঠা নং ৯১-৯৮।*

১. মুহাম্মদ বিন রাবী' বিন হাদী উমায়ের আল-মাদখাল।

الشيخ محمد بن ربيع بن هادي المدخلي .

(শাইখের বড় ছেলে, মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর।)

২. ডক্টর শাইখ ইসমাঈল মান্দাকার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

(শাইখ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছাত্র)।

৩. ডক্টর খালিদ বিন সাহ্ওয়া আয-যুফায়রী হাফিযাহুল্লাহ

الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري.

(কুয়েত এর প্রসিদ্ধ শাইখ এবং শাইখ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ)।

৪. শাইখ মুহাম্মাদ বিন হাদী আল-মাদখালী হাফিযাহুল্লাহ (মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর)।

৫. শাইখ আহমাদ বাজমূল হাফিযাহুল্লাহ। (মক্কার এক সুপরিচিত সালাফি দাঈ এবং গবেষক।)

৬. শাইখ আবদুল্লাহ আল-বুখারী

الشيخ عبد الله البخاري.

(হাদীস ও জারহ-ও-তা'দিল বিষয়ে দক্ষ।

সৌদী আরবের বিখ্যাত মুহাদ্দিস)।

৭. . শাইখ উবায়দ বিন আব্দুল্লাহ আল-জাবিরী

الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري.

❖ সৌদি আরবের মদীনায় বসবাসরত, আকীদা ও মানহাজ বিষয়ে সুপরিচিত, মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর)।

৮. শাইখ আব্দুর রাজ্জাক বদর হাফিযাহুল্লাহ।

الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله.

(মদীনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্বান)

৯. শাইখ মুহাম্মাদ ওমর বান্না।

الشيخ محمد عمر بازمول.

আহলে হাদীস ও আকীদার ওপর বিশিষ্ট গবেষক।)

১০. শাইখ বান্দর আল-খাইবেরী : (আকীদা ও তরীকার নামে প্রচলিত বিদ'আতের বিরুদ্ধে সক্রিয়।) প্রমুখ ছাত্রবৃন্দ।

এর বাইরেও অনেকেই পুরোপুরি তাঁর ছাত্র না হলেও তাঁর লেখনী ও বক্তব্য দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, বিশেষতঃ আফ্রিকা, ভারত, বাংলাদেশ, ইউরোপ, আমেরিকা ও ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে।

দাওয়াতি কার্যক্রম :

(ক) মাতৃভূমী সৌদী আরবে কর্মজীবনের ব্যস্ততার মাঝেই যেমন অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, ঠিক তদ্রূপ দাওয়াতি কার্যক্রম বাস্তবে রূপ দিতে সারা পৃথিবী চষে বেড়িয়েছেন।

নিজ মাতৃভূমি সৌদী আরবের আনাচে-কানাচে সুযোগ পেলেই ছুটেছেন দাওয়াতি কাজে। মক্কা, মদীনা, জেদ্দা, তায়েফ, রিয়াদ, জিযান, উনায়যা, নাজরান, হাফরুল বাতেন ইত্যাদি ছিল তাঁর দাওয়াতি মারকায।

(খ) দাওয়াতি কাজে বিদেশ সফর ;

১. ভারত সফর : শাইখ বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভারতে তিন বছর অবস্থান করেছেন। এই সময়ে তিনি ব্যাপক অবদান রেখেছেন, যা আমরা পূর্বে খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি।

এরপরেও তিনি একাধিকবার ভারত সফর করেছেন। তাঁর পাসপোর্ট-এর হিসাব অনুপাতে তিনি ভারতে ১৯৮০, ৮৫, ৯০ সনেও সফর করেছেন।

২. মিসর সফর : মিসর গমন করেছিলেন মূলত তার এমফিল থিসিস পেপার গবেষণার জন্য বেশ কিছু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি জমা করতে। এর ফাঁকে দাওয়াতি কার্যক্রম চলমান রেখেছেন।

৩. ইয়ামেন : তিনি ইয়ামেনে দুইবার সফর করেন। ১৩৭৯ হিজরী সনে প্রথমবার এবং ১৪০৩ হিজরীতে দ্বিতীয়বার। সেখানে তিনি বিভিন্ন কিতাবের ওপর দারস দিয়েছেন।

৪. বাংলাদেশ সফর : শাইখ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ১৪০১ হিজরী মোতাবেক ১৯৮১ সালে "দাওরা ইলমিয়্যাহ" তথা ইসলামী শিক্ষা কোর্স করানোর জন্য টানা দুই মাস (আরবী শা'বান এবং রমাজান) অবস্থান করেন।

এ সময় তিনি বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাইখ আল্লামা আলীমুদ্দীন নদিয়াভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর নিকট থেকে হাদীস-এর ইজাযাহ্ গ্রহণ করেন।

শাইখ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বাংলাদেশ সফরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন; "আমি বাংলাদেশ সফর করেছিলাম। সেখানে মদীনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটির এক গ্র্যাজুয়েট আমাকে বললেন, 'আমি আজ রাতে আপনাকে বারোটি কবর দেখাতে নিয়ে যাব, যেখানে আপনি এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখবেন, যা আপনি আগে কখনো দেখেননি।'

আমরা রওনা হলাম যাত্রাটা অনেক দীর্ঘ ছিল। আমরা এক মসজিদে পৌঁছালাম, সেখানে একটি কবর ছিল, যার ওপর ছিল উন্নতমানের কাঠের তৈরি একটি ঘেরা স্থান (মাজার)। আর সেই কবরের চারপাশে বহু মানুষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে কেউ কাঁদছে, কেউ একান্তভাবে মনোযোগী, কেউ রুকু করছে, কেউ সিজদা করছে। আর সেই মসজিদের চারপাশে বাজার চলছে- সেখানে ফুল, ধূপ-ধুনো ও কুসংস্কারমূলক জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে।

আমি আরেকটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখলাম- অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

তখন আমি বলেছিলাম, আল্লাহর কসম, যদি আবু জাহল এসব দৃশ্য দেখতো, সেও লজ্জা পেতো! কুরাইশরাও এমন কিছু কখনোই করতো না। তারা কখনো এত নিচু, অবনমিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। অথচ এটি করছে এমন কিছু লোক যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে।"[৩৫]

৫. পাকিস্তান সফর : শাইখ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ভারত এবং পাকিস্তানে একাধিকবার সফর করেছেন। তিনি পাকিস্তানে ১৯৮১, ৮৩, ৮৪, ৯২ সনে সফর করেছেন। সেখানে তিনি দাওয়াতি মাঠে ব্যাপক অবদান রেখেছেন।

৬. আফগানিস্তান সফর : ১৪০৮ হিজরী সনে শাইখ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), প্রখ্যাত সালাফী মুজাহিদ শাইখ জামিলুর রহমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জেদ্দা টু ইসলামাবাদ টু পেশোয়ার যান। সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন মদীনার বর্তমান অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্বান শাইখ আব্দুর রাজ্জাক বদর হাফিযাহুল্লাহকে।

পেশোয়ারে শাইখ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে অভ্যর্থনা জানান সরাসরী শাইখ জামিলুর রহমান হাফিযাহুল্লাহ।

এরপর তিনি সরাসরি আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আরব যোদ্ধাদের ক্যাম্পে গমন করেন। সেখানে তিনি উসামা বিন লাদেন এবং আব্দুল্লাহ আযযাম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। তাদেরসহ আরব যোদ্ধাদের নাসিহাহ করেন।

৭. সুদান সফর : শাইখ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সুদানে দু'বার সফর করেন। একবার মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাবস্থায়। এরপর দ্বিতীয়বার ১৩৯২ হিজরী সনে।

সেখানে তিনি ইলমী হালকা চালু করেন। শিরক, বিদ'আত, কুসংস্কার এবং হুলুল ও ওহদাতুল উজুদ এর মতো ঈমানী বিধ্বংসী আকীদা-বিশ্বাস সংস্কারে ব্যাপক অবদান রাখেন।

৮. শাইখের দাওয়াতে আফ্রিকার এক পুরো বংশের ইসলাম গ্রহণ : একদা শাইখ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) একটি কৃষি খামারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে এক খ্রিস্টান দম্পতি ছিল, দোভাষীর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন এবং বুঝানোর চেষ্টা করেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মত হয়। পরে তাদের পরিবারসহ পুরো বংশ ইসলাম গ্রহণ করেন।

৯. মরক্কো এবং তিউনিস সফর : বেশ কিছু হাদীস গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য ১৪০৭/৮ হিজরী সনে মরক্কো এবং তিউনিস সফর করেন।

১০. কুয়েত সফর : শাইখ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনবার কুয়েত সফর করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দারস দেন।[৩৬] চলবে ইনশাআল্লাহ

[৩৫] *আল-ফুসূল আল-মুদিয়্যাহ্ মিন সিরাতিশ শাইখ রাবী' বিন হাদী আল-মাদখালী, পৃষ্ঠা নং ১০৭-১০৮।*

[৩৬] *আল-ফুসূল আল-মুদিয়্যাহ্ মিন সিরাতিশ শাইখ রাবী' বিন হাদী আল-মাদখালী, পৃষ্ঠা নং ৯৯-১৩৫।*

ইবাদতের পরিচয় ও শর্তাবলী

আবু মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ[❈]

ভূমিকা :

মানব ও জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে মানবজাতির ইহকালীন জীবন হবে সুন্দর ও বরকতময় আর পরকালীন জীবন হবে সফল ও কল্যাণময়, তাদের জন্য চিরস্থায়ী পুরস্কার রয়েছে জান্নাত। পক্ষান্তরে আল্লাহর নাফরমানী করলে উভয় জীবন হবে ক্ষতিগ্রস্ত ও কষ্টদায়ক আর পরিনাম হবে খুবই ভয়াবহ ও বীভৎস; স্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। বুঝা গেল, মানবজীবনে ইবাদতের গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু ইবাদত করলেই উভয় জগতে সফলকাম হওয়া যাবে না; বরং কৃত ইবাদত আল্লাহ কাছে কবুল হতে হবে। আজকের প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ ইবাদত কবুলের শর্তাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

● ইবাদতের পরিচয় :

ক. আভিধানিক অর্থ :

ইবাদত (العبادة) আরবী শব্দ ; যার অর্থ হল অনুগত হওয়া, নত হওয়া, বিনম্র হওয়া, আনুগত্য করা ইত্যাদি। ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'العبادة هي الطاعة مع خضوع' 'ইবাদত হচ্ছে বিনয়ের সাথে আনুগত্য'।[৩৭] ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'والعبادة أصل معناه الذل' 'ইবাদতের আসল অর্থ বিনয়'।[৩৮] আবার বলা হয়, 'كل خضوع ليس فوقه خضوع فهو عبادة' 'প্রত্যেক ঐ বিনয় যার উপরে কোনো বিনয় নেই তাকে ইবাদত বলে'। (আলী আব্দুল লতিফ মানসুর, আল ইবাদাত ফিল ইসলাম।[৩৯]

খ. পারিভাষিক অর্থ : সালাফগণ ইবাদতের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যথা-

❖ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় গ্রন্থে বলেন,

﴿الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ.﴾

'ইবাদত হল এক ব্যাপক অর্থবোধক বিশেষ্য, যাতে আল্লাহর পছন্দ ও সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এমন সব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কাজ'।[৪০]

❖ হাফিয ইবনু কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

الْعِبَادَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَمَّا يَجْمَعُ كَمَالَ الْمَحَبَّةِ وَالْخُضُوعِ وَالْخَوْفِ .

'ইবাদত বলা হয় পরিপূর্ণ ভালবাসা, বিনয় ও ভীতির সমষ্টিকে'।[৪১]

❖ শাইখ বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

العبادة هي توحيده وطاعته مع تعظيم أوامره ونواهيه،

'ইবাদত হচ্ছে আল্লাহর একত্ব প্রকাশ করা এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করা'।[৪২]

সাধারণত, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ প্রতিপালনের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য-অনুস্বরণের নামই ইবাদত।

● ইবাদত কবুলের শর্তাবলী : আল্লাহর সন্তুষ্টি ও উভয় জগতে মুক্তি পেতে ইবাদতের বিকল্প নেই। আর আল্লাহ তা'আলা কোনো মুসলিমের ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত দুটি শর্ত পাওয়া না যায়। ইবাদত কবুলের শর্ত দুটি হল :

১. الإخلاص لله تعالي তথা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া।

২. المتابعة لرسول الله صلي الله عليه وسلم তথা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য করা।

❈ *আক্বীদা ও দাওয়াহ বিভাগ, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব। দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।*

৩৭ *উবাইদুল্লাহ রহমানী আল মুবারকপুরী, মিরআতুল মাফাতিহ শারহু মিশকাতিল মাসাবিহ, ১ম খণ্ড,পৃ.৬১।*

৩৮ *শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, মাজমূয়িল ফাতাওয়া, ১০ম খণ্ড,পৃ. ১৫৩।*

৩৯ *(প্রকাশক : মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০৪ হিজরী), পৃ. ১১২।*

৪০ *মুহাম্মাদ হাসান আব্দুল গাফফার, শারহু কিতাবুল ফিরাক, ২য় খণ্ড,পৃ. ৪।*

৪১ *ইমাম ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ১ম খণ্ড, পৃ.১৩৪*

৪২ *শায়খ ইবনু বায, মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায, ১ম খণ্ড, পৃ.৩২৪।*

☑ ১. **الإخلاص لله تعالي**। তথা ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া।

● ইখলাস এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : ইখলাস শব্দটি আরবী; যা বাবে إفعال-باب এর মাসদার। যার অর্থ কোনো জিনিস পরিশুদ্ধ করা, আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা, নির্ভেজাল ইত্যাদি। যেমন- **أَخْلَصَ الرَّجُلُ دِيْنَهُ لِلّٰه** অর্থাৎ লোকটি তার দ্বীনকে শুধুই আল্লাহর জন্য নির্ভেজাল করেছে। জুরজানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, **الإخلاص في اللغة ترك الرياء في الطاعات** 'শাব্দিক অর্থে ইখলাস হল, সৎকাজে লৌকিকতা পরিহার করা'।[৪৩] আবার কেউ বলেছেন, **تصفية العمل من كل شوب** বা সকল ত্রুটি থেকে কাজের বিশুদ্ধতা।[৪৪] কারো মতে, تنقية الشيء وتهذيبه বা কোনো জিনিসকে বিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করা। (ড. হামেদ বিন মুয়াবিজ আল হোজাইলী, মুকাওওমাতুদ দাঈ ইলাল্লাহ।[৪৫] আর মুখলিস বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে নিরেট নির্ভেজালভাবে আল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহীদে বিশ্বাসী। এজন্য (**قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ**) সূরাকে সূরাতুল ইখলাস বলা হয়।

পারিভাষিক অর্থ : ইসলামী শারঈ পরিভাষায়,

هو ترك الرياء والسمعة، وإسلام الوجه لله بإخلاص القصد والعمل له.

"ইখলাস হল লৌকিকতা ও সুখ্যাতি পরিহার করা এবং আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ নিয়ত ও আমল করার মাধ্যমে নিজেকে সমর্পণ করা"। (ড. হামেদ বিন মুয়াবিজ আল হোজাইলী, মুকাওওমাতুদ দাঈ ইলাল্লাহ)[৪৬]

❖ ইবনুল ক্বাইয়িম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, **الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة**- 'স্বেচ্ছায় একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদত নিবেদনকে ইখলাস বলে'।[৪৭]

❖ হুযাইফা আল-মার'আশী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, **الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن**- 'বান্দার কাজ ভেতর-বাহির থেকে একরকম হওয়াকে ইখলাস বলে'।[৪৮]

❖ কেউ কেউ বলেছেন, **الإخلاص تصفية الأعمال من الكدورات**'আমল বা কাজকে ত্রুটিমুক্ত করাই ইখলাস'।[৪৯]

❖ কারো মতে, **الإخلاص هو إبتغاء وجه الله وحده بالعمل الصالح** 'সৎ আমলের মাধ্যমে কেবলমাত্র এক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাকে ইখলাস বলে'।[৫০]

● ইখলাসের গুরুত্ব :

ইখলাস একটি আন্তরিক আমল বা ইবাদত। আর ইখলাসই সকল ইবাদতের প্রাণ। কোনো ইবাদত কবুল হওয়া না হওয়া ইখলাসের ওপর নির্ভর করে। এটি অন্তরের আমলসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যুগে যুগে আগত নবী-রাসূলদের দাওয়াতের চাবিকাঠি ছিল ইখলাস। তাই সকলের জন্য ইখলাস অর্জন করা আবশ্যক।

১. ইখলাসের সাথে ইবাদত করতে আল্লাহর নির্দেশ প্রদান।

মহান আল্লাহ বলেন, **وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ** 'অথচ তাদেরকে এছাড়া কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা বিশুদ্ধ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে'।[৫১] তিনি আরো বলেন, **أَلاَ لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ**، 'সাবধান, খালেস দ্বীন বা ইবাদত কেবল আল্লাহর'।[৫২] বুঝা গেল, ইবাদত হতে হবে খালেস আন্তরে এবং কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাহলেই আমাদের ইবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে; অন্যথায় নিস্ফল হবে।

---

[৪৩] *আলী বিন মুহাম্মদ আশ শরীফ আল জুরজানী, আত-তা'রীফাত, পৃ. ১৩।*
[৪৪] *মুহাম্মাদ বিন আলান আল মাক্কী, আল ফুতুহাতুর রব্বানিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ.৭৭।*
[৪৫] *সৌদি আরব- মদিনা: মাকতাবাতু খযানাতিল উলূম, ১ম সংস্করণ, ২০২৩), পৃ.৩৬।*
[৪৬] *সৌদি আরব- মদিনা মাকতাবাতু খযানাতিল উলূম, ১ম সংস্করণ, ২০২৩), পৃ. ৩৮।*
[৪৭] *ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৮।*
[৪৮] *মুহাম্মাদ বিন আলান আল-মাক্কী, আল-ফুতুহাতুর রব্বানিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩।*
[৪৯] *আলী বিন মুহাম্মদ আশ-শরীফ আল জুরজানী, আত-তা'রীফাত, পৃ. ১৪।*
[৫০] *আদ-দিরাসাতুল ইসলামিয়্যাহ মুতা/২য়, ৩০ পৃঃ*
[৫১] *সূরা আল-বাইয়িন্যাহ আয়াত : ৫।*
[৫২] *সূরা আয-যুমার আয়াত : ৩।*

২. সকল আমলের প্রতিদান নিশ্চিত হবে ইখলাসের ওপর নির্ভর করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى،

'নিশ্চয়ই প্রতিটি কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পায়'।[৫৩] এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদীস। কেননা এতে শরী'আতের এমন একটি মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে, যার আধীনে সকল ইবাদত। কোনো ইবাদতই তার থেকে বাদ যায় না। সুতরাং সালাত, সিয়াম, জিহাদ, হজ্জ, যাকাত, দান-সদক্বা ইত্যাদি প্রত্যেক ইবাদত বিশুদ্ধ নিয়ত ও ইখলাসের মুখাপেক্ষী।

৩. প্রিয়নবী ﷺ-এর সকল ইবাদত ছিল ইখলাসে পরিপূর্ণ। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِيْنِيْ- 'হে নাবী! আপনি বলুন, আমি আল্লাহর ইবাদত করি তাঁর জন্য আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করার মাধ্যমে'।[৫৪] তিনি আরো বলেন,

﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ-﴾

'হে নাবী! আপনি বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ, সবই বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই। আর এ ব্যাপারেই (অর্থাৎ শরীক না করার ব্যাপারে) আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম'।[৫৫] রাসূল ﷺ সকল ইবাদত ইখলাসের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেছেন; সুতরাং আমাদের ইবাদতেও যেন ইখলাস থাকে। তবেই আমাদের ইবাদত ফলদায়ক হবে।

৪. ইখলাসহীন ইবাদত আল্লাহর কাছে অগ্রহণযোগ্য। যদি মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যের নৈকট্য লাভের নিয়ত করে এবং ইবাদাতের মাধ্যমে মানুষের প্রশংসা অর্জনের নিয়ত করে, তাহলে তার আমল বাতিল হয়ে যাবে; এটা শির্কের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে, নবী কারীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ বলেন,

﴿أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ﴾

"আমি সমস্ত শির্ককারীদের শির্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল, যাতে সে আমার সাথে অন্য কোনো কাউকে শরীক করল, তাহলে আমি তাকে এবং সে যা শরীক করল, তাকে প্রত্যাখ্যান করব'।[৫৬] বুঝা গেল, যে ইবাদতে ইখলাস থাকবে না, সে ইবাদত আল্লাহর কাছে কখনোই কবুল হবে না।

❖ উপরের আলোচনা থেকে শিক্ষা :

১. ইবাদতের মধ্য ইখলাস থাকতে হবে, তাহলে সেই ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন।

২. ইখলাস ছাড়া আমল ফলবিহীন বৃক্ষের ন্যায়।

৩. সকল ধরনের ত্রুটি থেকে ইবাদতকে পরিশুদ্ধ করতে হবে।

৪. ইখলাসপূর্ণ ইবাদত করাই মহান আল্লাহর নির্দেশ।

৫. লৌকিকতা ও সুখ্যাতি যেন ইবাদতে প্রবেশ করে ইখলাস বিনষ্ট করতে না পারে, সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা।

৬. ইখলাসের ভিত্তিতে ইবাদতের প্রতিদান দেওয়া হবে।

৭. নবী-রাসূলদের দাওয়াতের মূলনীতি ছিল ইখলাসপূর্ণ আমল করা।

৮. ইবাদতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন মানেই উভয় জগতে মুক্তি।

☑ ২. المتابعة لرسول الله صلي الله عليه وسلم তথা ইবাদতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য করা।

● রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য দ্বারা উদ্দেশ্য : ইসলামী শারঈ পরিভাষায়,

أن يكون العبادة موافقا لسنة النبي صلي الله عليه وسلم من غير زيادة عليها ولا نقصان .

"কোনো প্রকার কম-বেশি ছাড়া সহীহ নাবী কারীম ﷺ-এর সুন্নাহ অনুযায়ী ইবাদত হতে হবে"।[৫৭]

---

[৫৩] *সহীহ বুখারী ১; সহীহ মুসলিম : ১৯০৭; মিশকাতুল মাসাবীহ : ১*
[৫৪] *সূরা আয-যুমার আয়াত : ১৪।*
[৫৫] *সূরা আল-আন'আম আয়াত : ১৬২, ১৬৩।*
[৫৬] *সহীহ মুসলিম হা : ২৯৮৫ ; সহীহুল জামে' ৪৩১৩।*
[৫৭] *আদ-দিরাসাতুল ইসলামিয়্যাহ মুতা/২য়, পৃ.৩০।*

কেউ কেউ বলেছেন,

إتخاذ ما أمر رسول الله وإبعاد ما نهي عنه من غير إفراط ولا تفريط .

কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি-শৈথিল্য ছাড়া হুবহু রাসূল ﷺ যা করতে আদেশ করেছেন, তা পালন করা এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে দূরে থাকা।

আবার কারো মতে, **أن يكون العمل موافقا لسنة من غير تحريف ولا إِضَافَة** "আমলটা হওয়া সুন্নাহ মোতাবেক কোনো ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই"।

❖ **রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যের গুরুত্ব :** আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশা দিতে নাবী কারীম ﷺ কে প্রেরণ করেছেন। তিনি সর্বশেষ নাবী; তার পরে আর কোনো নাবী আসবে না। তাই আগত সকল মানুষের একমাত্র আদর্শ হল মুহাম্মদ ﷺ। আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী ব্যতীত তিনি নিজ থেকে কোনো কথা বানিয়ে বলেননি। সুতরাং যার ইবাদত রাসূল ﷺ পদ্ধতিতে হবে, তার ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন এবং তাকে দিবেন জান্নাত। তাই উভয় জগতে মুক্তি পেতে রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করা সকলের জন্য আবশ্যিক বিষয়।

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমরা তোমাদের আমলগুলো বিনষ্ট করো না"।[৫৮] তিনি আরো বলেন, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "আর তোমরা আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য কর, সম্ভবত তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে"[৫৯]

২. আদেশ-নিষেধ মান্য করার মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ.﴾

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেয়, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর"।[৬০]

৩. রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করার পাশাপাশি পাপ মোচন হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾

হে নাবী! আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"।[৬১]

৪. রাসূলের আনুগত্য করা মানেই আল্লাহর আনুগত্য করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَ مَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا﴾

"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে বিমুখ হল, তবে আমি তোমাকে তাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে প্রেরণ করিনি"।[৬২]

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন,

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ.

"যে আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর যে আমার অবাধ্যতা করলো সে আল্লাহরই অবাধ্যতা করলো"।[৬৩]

৫. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতায় শাস্তির ঘোষণা। মহান আল্লাহ বলেন,

---

[৫৮] *সূরা মুহাম্মাদ আয়াত : ৩৩।*
[৫৯] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১৩২।*
[৬০] *সূরা আল-হাশর আয়াত : ৭।*
[৬১] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ৩১।*
[৬২] *সূরা আন-নিসা আয়াত : ৮০।*
[৬৩] *সহীহ মুসলিম হা : ৪৫৯৭।*

﴿وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَ لَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ﴾

"আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করে এবং তাঁর সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তাঁর জন্যই রয়েছে অপমানজনক শাস্তি"।[৬৪] তিনি আরো বলেন, وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا "আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে"।[৬৫] আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন,

كُلُّ أُمَّتِي يَدخُلُونَ الجَنَّةَ إلاَّ مَنْ أَبَى قيلَ : وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.

আমার উম্মাতের সবাই জান্নাতে যাবে; কিন্তু সে নয় যে অস্বীকার করবে। জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! (জান্নাতে যেতে আবার) কে অস্বীকার করবে?' তিনি বললেন, যে আমার অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে যাবে এবং যে আমার অবাধ্যতা করবে, সেই জান্নাত যেতে অস্বীকার করবে"।[৬৬]

৬. রাসূল ﷺ-এর আদর্শ বহির্ভূত সকল ইবাদত বা কাজ প্রত্যাখ্যানযোগ্য। রাসূল ﷺ বলেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"যে কেউ এমন আমল করবে যা করতে আমরা নির্দেশ দেইনি, তা প্রত্যাখ্যাত"।[৬৭]

● রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য কেমন হবে?

সর্বশেষ রাসূল হলেন আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ﷺ এবং তিনিই কিয়ামতের দিন সকল উম্মাতের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ। সুতরাং তাঁর আনুগত্যও হবে সর্বোত্তম পন্থায়। তিনি ইবাদত-বন্দেগি যেভাবে করেছেন, যেভাবে করতে বলেছেন, হুবহু অবিকল সেইভাবে ইবাদত করাই হল রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي "তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবে সালাত আদায় কর"।[৬৮] অতএব সকল ইবাদত - বন্দেগি রাসূলের দেখানো পদ্ধতিতে হতে হবে, তাহলেই ইবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

❖ **উপরের আলোচনা থেকে শিক্ষা :**

১. সকলের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা আবশ্যক।

২. রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য ব্যতীত সকল ইবাদত আল্লাহর কাছে অগ্রহণযোগ্য।

৩. ইবাদত কবুলের দ্বিতীয় শর্ত ইবাদত রাসূলের পদ্ধতিতে হওয়া।

৪. রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য বলতে তিনি যা করতে বলেছেন, তা করা এবং যা করতে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা।

৫. রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি, ভালোবাসা, আনুগত্য অর্জিত হয়।

৬. রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করলে পাপ মোচন হয় এবং জান্নাতের অধিবাসী হওয়া যায়।

৭. রাসূল ﷺ-এর অবাধ্য হলে আল্লাহ অখুশী হন এবং শাস্তি হিসেবে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হয়।

৮. রাসূল ﷺ করতে বলেননি, এমন সকল কাজ/ ইবাদত প্রত্যাখ্যাত; হোক তা ভালো বা মন্দ।

● উপসংহার :

দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য পাঠিয়েছেন। পরকালীন সুখ-শান্তি পেতে ইবাদতের বিকল্প নেই। জান্নাতের আশায় আমরা প্রতিনিয়ত ইবাদতও করছি বটে; কিন্তু আমরা কি কখনো খেয়াল করেছি ইবাদত এই দুটি শর্তের আলোকে হচ্ছে কিনা? আমাদের ইবাদত এই দুটি শর্তের আলোকে হলে আমরা সফলকাম; অন্যথায় নিঃস্ফল হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ইখলাস ও রাসূলের পদ্ধতিতে ইবাদত- বন্দেগি করিয়ে কিয়ামতের দিন সফলকাম করুন, আমীন।❑❑

[৬৪] *সূরা আন-নিসা আয়াত : ১৪।*
[৬৫] *সূরা আল-আযহাব আয়াত : ৩৬।*
[৬৬] *সহীহ বুখারী হা : ৭২৮০।*
[৬৭] *সহীহ মুসলিম হা : ১৭১৮।*
[৬৮] *সহীহ বুখারী হা : ৬৩১।*

কালো জাদু ও বদ নজর নিয়ে কিছু কথা

সাইদুর রহমান*

দিন যত যাচ্ছে তত মানুষের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, রাগ ও অহংকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে একজন আরেকজনের ক্ষতি করার জন্য, একজন আরেকজনকে হত্যা করার জন্য কালো জাদুর আশ্রয় গ্রহণ করছে। এই জাদুর প্রভাব থেকে কিভাবে বাঁচা যাবে তাই নিয়ে বক্ষমান প্রবন্ধে কিছু দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

মানুষ যেন সমস্যার সম্মুখীন না হয় এজন্য ইসলাম আগে থেকেই সতর্ক করেছে। মানুষকে যেন কেউ ক্ষতি করতে না পারে এজন্য নবী ﷺ আগে থেকেই সবকিছু বলে দিয়েছেন। প্রবন্ধটি শুরু করার আগে কিছু কথা না বললেই নয়।

মানুষের দু'ধরনের শত্রু রয়েছে। (এক) মানুষ শত্রু (দুই) জিন শত্রু। মানুষ শত্রু আমাদের সাথেই চলাফেরা করে। তাকে দুচোখে দেখা যায়। আমাদের সাথে মিশে। মাঝে মধ্যে মুচকি হাসি দিয়ে কথা বলে। এই শত্রু ভালো-মন্দ বুঝে। নিজের লাভ-লোকসান আঁচ করতে পারে। কিছু উপহার দিলে বা তাকে সম্মান করলে আনন্দিত হয়। এই শত্রুকে আমাদের করতলগত করার পন্থা আল্লাহ তা'আলা বাতলে দিয়েছেন। এই শত্রুকে দু'ভাবে কাবু করা যায়।

১. উপহার উপঢৌকন দিলে। নবী ﷺ বলেন, تَهَادُوْا تَحَابُّوْا-উপহার দাও, ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।[৬৯]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾

ভালো ও মন্দ কখনোই সমান নয়। উৎকৃষ্ট পন্থায় প্রতিহত করো। তোমার মাঝে ও তার মাঝে যদি শত্রুতা থাকে তাহলে অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে।[৭০]

২. সালাম দিলে। নবী ﷺ মদীনায় আগমন করলেন। তাঁর আসার আগে মদীনাতে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় হরহামেশা দ্বন্দ্ব কলহে লিপ্ত থাকতো। সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। নবী ﷺ মদীনাতে এসে তাদের পরস্পরের শত্রুতার তিক্ততা সালামের মিষ্টতার মাধ্যমে শেষ করলেন। নবী ﷺ ব্যাপকভাবে ঘোষণা করলেন,

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ."

মুমিন না হলে তোমরা জান্নাতে যেতে পারবে না। আর একে অপরকে ভালো না বাসলে মুমিন হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয় বাতলে দিবো না, যা করলে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসবে? তোমাদের মাঝে সালামের ব্যাপক প্রচার প্রসার ঘটাও।[৭১]

মানুষের দ্বিতীয় শত্রু হলো শয়তান। শয়তান আমাদের সাথে চলাফেরা করে না। আমাদের সাথে থাকে না। আমরা তাকে দেখি না। সে উপহার উপঢৌকন গ্রহণ করে না। সালাম দিলে কোনো কাজ হবে না। দেখাই যায় না সালাম দিবো কীভাবে! শয়তানকে আমরা দেখি না ঠিক আছে; কিন্তু শয়তান আমাদের ভালো করেই দেখে।

﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

সে (শয়তান) ও তার দলবল তোমাদের দেখতে পায়; কিন্তু তোমরা তাদের দেখতে পাও না। যারা ঈমান আনে না আমরা শয়তানদের তাদের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি।[৭২]

---

* সাবেক ছাত্র, এম এম আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[৬৯] সহীহুল জামে, হা : ৩০০৪।

[৭০] সূরা ফুসসিলাত আয়াত : ৩৪।

[৭১] সহীহ মুসলিম হা : ৫৪।

[৭২] সূরা আল-আরাফ আয়াত : ২৭।

শয়তানকে যেহেতু দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, সেহেতু তাকে প্রতিহত করতে হবে এমন এক সত্তার মাধ্যমে, যিনি শয়তানকে দেখেন; কিন্তু শয়তান তাঁকে দেখতে পায় না। বলুন তো তিনি কে? হ্যাঁ, তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। শয়তানকে কাবু করতে হলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

শয়তানের কোনো ধোঁকা টের পেলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে। কেননা তিনি সবকিছু শ্রবণ করেন ও জানেন।[৭৩]

﴿وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ﴾

(হে নবী) বলো, হে আমার রব! শয়তানদের খোঁচা (প্ররোচনা) থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তান আমার কাছে উপস্থিত হওয়া থেকে।[৭৪]

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾

মুত্তাকীদের শয়তানের কোনো দল ধোঁকা দিলে তারা (আল্লাহকে) এমনভাবে স্মরণ করে, যেন তারা দেখছে।[৭৫]

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

'যখন কুরআন পড়বে, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।[৭৬]

আমাদের যেন জাদুর প্রভাব না পড়ে এজন্য নবী ﷺ কিছু আমল শিখিয়েছেন। আমরা যদি নিয়মিত, বিশ্বাসের সাথে এই আমলগুলো করতে পারি তাহলে জাদুকর যতই জাদু করুক কোনো কাজে আসবে না। তো চলুন আমলগুলো জেনে নেই।

১. সূরা ইখলাস, নাস ও ফালাক পড়া : ফজর ও মাগরিবের সালাতের পর এই তিনটি সূরা তিনবার করে নয়বার পড়বেন। আর বাকি তিন সালাতের পর তথা, যোহর, আসর ও এশার সালাতের পর এই তিনটি সূরা একবার করে পড়বেন। রাতে ঘুমানোর সময় এই তিনটি সূরা তিনবার পড়ে হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে মাথার ওপর থেকে সমস্ত শরীরে হাত বুলাবেন। তারপর আবার তিনবার পড়ে একইভাবে হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে মাথার ওপর থেকে সমস্ত শরীরে হাত বুলাবেন। আবার তিনবার পড়ে একইভাবে হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে মাথার ওপর থেকে সমস্ত শরীরে হাত বুলাবেন।

২. আয়াতুল কুরসি পড়া : প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসি পড়া এবং রাতে ঘুমানোর সময় শুয়ে আয়াতুল কুরসি পড়া।

৩. রাতে সূরা বাকারা পড়া : নবী ﷺ বলেন,

لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ."

তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে কবর সদৃশ করে রেখো না। নিশ্চয় শয়তান যে ঘরে সূরাহ বাক্বারাহ পাঠ করা হয় সেই ঘর থেকে পালিয়ে যায়।[৭৭]

৪. সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়া : রাতে কেউ যদি সূরা বাকারা সম্পূর্ণ করতে না পারেন তাহলে কমপক্ষে সূরা বাকারার শেষ ২ আয়াত অবশ্যই পাঠ করবেন। নবী ﷺ বলেন,

مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَاهُ.

কেউ যদি রাতে সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করে, সেটাই তার জন্য যথেষ্ট।[৭৮]

হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কেউ রাতে সূরা বাকারার শেষ ২ আয়াত পড়লে শয়তান ওই রাতে তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।[৭৯]

[৭৩] *সূরা ফুসসিলাত আয়াত : ৩৫।*
[৭৪] *সূরা আল-মুমিনুন আয়াত : ৯৭-৯৮।*
[৭৫] *সূরা আল-আরাফ আয়াত : ২০১।*
[৭৬] *সূরা আন-নাহল আয়াত : ৯৮।*
[৭৭] *সহীহ মুসলিম হা : ৭৮০।*
[৭৮] *সহীহ বুখারী হা : ৫০০৯।*

৫. নিচের দু'আটি দিনের মাঝে একশো বার পড়া :

নবী ﷺ বলেন,

" مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ. فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ".

যে লোক একশ বার এ দু'আটি পড়বে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহা নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান'। তাহলে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব তার হবে। তার জন্য একশ'টি সওয়াব লেখা হবে এবং আর একশটি গুনাহ মিটিয়ে ফেলা হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হতে মাহফুজ থাকবে। কোনো লোক তার চেয়ে উত্তম সওয়াবের কাজ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর চেয়ে ঐ দু'আটির আমল বেশি পরিমাণ করবে।[৮০]

সকালে ফজর সালাতের পর এই দু'আটি একশ বার পড়ে নিবেন তাহলে সারাদিন আর শয়তান আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

৬. রাতে ঘরে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ বলা এবং খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলা :

নবী ﷺ বলেন,

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ . وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ . وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ. "

যখন কোনো ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ এবং খাবার গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে, তখন শয়তান হতাশ হয়ে (তার সঙ্গীদের) বলে- তোমাদের (এখানে) রাত্রি যাপনও নেই, খাওয়াও নেই। আর যখন সে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে আল্লাহর নাম স্মরণ না করে, তখন শয়তান বলে, তোমরা থাকার স্থান পেয়ে গেলে। আর যখন সে খাবারের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ না করে, তখন সে (শয়তান) বলে, তোমাদের নিশি যাপন ও রাতের খাওয়ার আয়োজন হলো।[৮১]

৭. টয়লেটে যাওয়ার সময় নিচের দু'আটি পড়া : নবী ﷺ যখন বাথরুমে যেতেন তখন নিচের দু'আটি পাঠ করতেন,

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

এই দু'আটি পাঠ করলে শয়তান মানুষকে কোনো ওয়াসওয়াসা দিতে পারে না।[৮২]

৮. বাচ্চাদের যেন বদনজর ও কালো জাদু না লাগে এজন্য নিচের দু'আটি পড়ে তাদের ফুঁ দেয়া :

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ ".

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ঠ হতে পানাহ চাচ্ছি।[৮৩]

নবী ﷺ হাসান ও হোসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-কে এই দু'আ পড়ে ফুঁ দিতেন।

উপরের আমলগুলো যদি আপনি নিয়মিত করে যান এবং সাথে সাথে সকাল ও সন্ধ্যার দু'আগুলো পাঠ করেন তাহলে আপনি কালো জাদু ও বদ নজর থেকে রক্ষা পাবেন ইনশাআল্লাহ।

শয়তান কোথায় থাকে?

শয়তান দু'টি জায়গায় বেশি অবস্থান করে।

[৭৯] সহীহ বুখারী হা : ৫০০৯।
[৮০] সহীহ বুখারী হা : ৩২৯৩।
[৮১] সহীহ মুসলিম হা : ২০১৮।
[৮২] সহীহ বুখারী হা : ১৪২।
[৮৩] সহীহ বুখারী হা : ৩৩৭১।

১. খালি ও পরিত্যক্ত ঘরে। এটা আমরা বুঝতে পারি নিচের হাদীস থেকে। নবী ﷺ বলেন,

فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ.

একটি শয্যা পুরুষের, দ্বিতীয় শয্যা তার স্ত্রীর, তৃতীয়টি অতিথির জন্য আর চতুর্থটি (যদি প্রয়োজনীতিরিক্ত হয়) শয়তানের জন্য।[৮৪]

হাদীসের মধ্যে নবী ﷺ অপ্রয়োজনীয় চতুর্থ ঘরটিকে শয়তানের জন্য নির্ধারণ করেছেন। এজন্যই দেখা যায় যারা গ্রামের বাড়িতে বড় বড় বিল্ডিং করে শহরের মধ্যে অবস্থান করে তাদের ওই বাড়িগুলোর মাঝে শয়তানরা বসবাস করে।

২. অন্ধকার স্থানের মধ্যে। এটা আমরা বুঝতে পারি নিচের হাদীস থেকে।

নবী ﷺ বলেন,

" إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ ـ أَوْ أَمْسَيْتُمْ ـ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخُلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا ". قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَ مَا أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ وَلَمْ يَذْكُرْ " وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ".

যখন রাতের আঁধার নেমে আসবে অথবা বলেছেন, যখন সন্ধ্যা হয়ে যাবে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে আটকিয়ে রাখবে। কেননা এসময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। আর যখন রাতের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হবে তখন তাদেরকে ছেড়ে দিতে পার। তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করবে এবং আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করবে। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না।[৮৫]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, শয়তান অন্ধকার স্থানে বসবাস করে।[৮৬]

শয়তান তাড়াবেন কীভাবে?

শয়তান দুইভাবে তাড়ানো যায়।

১. যেই ঘরে শয়তান বসবাস করে ওই ঘরে আযান দিবেন। কারণ শয়তান আযান শুনতে পারে না। আযান দিলে চলে যায়। হাদীস থেকে এর প্রমাণ দেখুন। নবী ﷺ বলেন,

" إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا. لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى ".

যখন সালাতের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান হাওয়া ছেড়ে পলায়ন করে, যাতে সে আযানের শব্দ না শুনে। যখন আযান শেষ হয়ে যায়, তখন সে আবার ফিরে আসে। আবার যখন সালাতের জন্য ইক্বামাত বলা হয়, তখন আবার দূরে সরে যায়। ইক্বামাত শেষ হলে সে পুনরায় ফিরে এসে লোকের মনে কুমন্ত্রণা দেয় এবং বলে এটা স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর, বিস্মৃত বিষয়গুলো সে মনে করিয়ে দেয়। এভাবে লোকটি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সে কয় রাক'আত সালাত আদায় করেছে তা মনে করতে পারে না।[৮৭]

উপরের হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন, শয়তান আজান শুনতে পারে না। আযান শুনলে সে পলায়ন করে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে ঘর থেকে শয়তান তাড়ানোর উপায় হচ্ছে আজান দেয়া।

২. সূরা বাকারা পাঠ করা

নবী ﷺ বলেন,

[৮৪] সহীহ মুসলিম হা : ২০৮৪।
[৮৫] সহীহ বুখারী হা : ৩৩০৪।
[৮৬] ফাতহুল বারী হা : ৩৩০৪।
[৮৭] সহীহ বুখারী হা : ৬০৮।

لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. "

তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে কবর সদৃশ করে রেখো না। নিশ্চয় শয়তান যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয় সেই ঘর থেকে পালিয়ে যায়।[৮৮]

আপনি যদি সূরা বাকারা পড়তে না পারেন তাহলে মোবাইলের মধ্যে সূরা বাকারা ছেড়ে রাখুন। শয়তান সূরা বাকারা শুনলে আর আসবে না।

কারো বদ নজর অথবা জাদু লেগে গেলে কীভাবে তাকে সুস্থ করবেন?

আপনার বাচ্চা মা-শা-আল্লাহ ভালো খায়, খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কোনো বিরক্ত করে না। আপনার পাশের বাড়ির ভাবী এসে বলতেছে আপনার বাচ্চা তো অনেক খায়! আমার বাচ্চা একেবারেই খায় না। অথবা আপনার পাশের বাড়ির ভাবী এসে বলছে, আপনার বাচ্চা তো অনেক সুন্দর, ফুঁটফুটে! এর পরের দিন থেকে আপনার বাচ্চা আর আগের মতো খাওয়া দাওয়া করেন, অথবা আপনার বাচ্চার শরীরে ঘা হয়েছে অথবা চোখ মুখ ফুলে গেছে অথবা অন্য কোনো রোগ হয়েছে! আমাদের সমাজে প্রায়শই এমন হয়ে থাকে। এমন হলে আপনার যদি সন্দেহ হয় যে, পাশের বাড়ির ভাবীর এই কথা বলার কারণে এমন হয়েছে তাহলে আপনি তাকে ডেকে আনবেন। এনে বলবেন, ভাবী, আপনি আমার বাচ্চার জন্য অযু করুন। মনে হচ্ছে আপনার চোখ লেগেছে আমার বাচ্চার ওপর। এই মুহূর্তে আপনার ভাবী কিন্তু রেগে যাবেন। তিনি বলবেন, না, না। আমার চোখ লাগেনি! ওই সময় আপনি তাকে বুঝিয়ে বলবেন, ভাবী, কারো চোখ লাগাটা স্বাভাবিক। আমি যেহেতু আপনাকে সন্দেহ করছি, সেহেতু এখন আপনার অযু করে পানি দেয়া ওয়াজিব। আপনি যদি অযু করে পানি না দেন তাহলে গুনাহগার হবেন। তাই অবশ্যই আপনাকে অযুর পানি দিতে হবে।

অযুর পানি কীভাবে দিবেন?

বালতির মাঝে পানি নিয়ে ওই বালতিটা কোনো কিছুর উপরে রাখবেন। মাটিতে রাখা যাবে না। তারপর যে ব্যক্তির চোখ লেগেছে তথা পাশের বাড়ির ওই ভাবী বালতি থেকে এক আঁজলা পানি নিয়ে কুলি করে ওই কুলির পানি বালতিতে ফেলবে। তারপর মুখমণ্ডল ধৌত করবে। তারপর বাম হাত দিয়ে পানি নিয়ে ডান হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে। তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে। এরপর ডান ও বাম হাতের কনুই ধৌত করবে। এরপর ডান ও বাম পায়ের টাখনু পর্যন্ত ধৌত করবে। এরপর দুই পায়ের হাঁটু ধৌত করবে। তারপর লুঙ্গি বা পায়জামার নিচের অংশ তথা নাভির নিচে কোমর পর্যন্ত ধৌত করবে। তারপর ওই পানি ওই বাচ্চার পেছন দিক থেকে একবারে তার মাথায় ঢেলে দিবে। এভাবে পানি ঢেলে দিলে অবশ্যই বাচ্চা সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আর আপনি যদি না জানেন আপনার বাচ্চার কার চোখ লেগেছে তাহলে এর চিকিৎসা হচ্ছে, সাতটি বরই পাতা ও সাতটি বরই কাঁটা নিয়ে এগুলোকে শিলপাটা ও পুতায় পিষে নেবেন। তারপর এক বালতি পানি নিয়ে ওইগুলো পানিতে মিশিয়ে ওই পানিতে তিনবার করে সূরা নাস, ফালাক ও ইখলাস পড়ে ফুঁ দিবেন। তারপর সাত বার সূরা ফাতেহা পড়ে ফুঁ দিবেন। তারপর আয়াতুল কুরসি পড়ে ফুঁ দিবেন। তারপর সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়ে ফুঁ দিবেন। এভাবে ওই রোগীকে তিনদিন গোসল করাবেন। ইনশাআল্লাহ আপনার বাচ্চা সুস্থ হয়ে যাবে।[৮৯]

আপনি যদি মনে করেন কেউ আপনাকে জাদু করেছে তাহলে আপনি এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটা গ্রহণ করুন। উপরের পদ্ধতিটা হচ্ছে বদ নজর এর ক্ষেত্রে। আর পরের পদ্ধতিটা হচ্ছে বদ নজর ও জাদু উভয়টির ক্ষেত্রে।

বদ নজর লাগে কেন?

আসলে কথা হচ্ছে, মানুষের চোখ লাগে না। বরং মানুষের ভেতর যে রাগ, হিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা আছে এগুলো বিষ হয়ে মানুষের চোখ দিয়ে বের হয়। যার ফলে মানুষ ওই বিষের ক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি

[৮৮] সহীহ মুসলিম হা : ৭৮০।

[৮৯] ফাতহুল বারী, হা : ৫৭৬৫, ১৩/১৮৩।

স্পষ্ট হবে। মনে করুন, আপনার ব্যবসা দিন দিন উন্নতির দিকে যাচ্ছে। আর আপনার চাচাতো ভাইয়ের ব্যবসার দিন দিন অবনতি হচ্ছে। এই বিষয়টি নিয়ে আপনার চাচাতো ভাই আপনার সাথে হিংসা করে। সে কোনো একদিন বলছে, তোর ব্যবসা শুধু দিন দিন উন্নতিই হচ্ছে আর আমার সব শেষ। এরপর দেখা গেছে, আপনার ব্যবসাও লোকসানের দিকে যাচ্ছে। ঐ যে আপনার চাচাতো ভাইয়ের মনের হিংসা আপনার ওপর পড়েছে এজন্যই আপনার এ অবস্থা হয়েছে। তাহলে বুঝতে পারলাম মানুষের চোখ মূলত লাগে না। বরং তাদের অন্তরের হিংসা, বিদ্বেষ, রাগ এগুলো বিষ হয়ে চোখ দিয়ে বের হয়। যার ফলে মানুষ ওই বিষের ক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়ে।

<u>জাদু ও বদ নজর থেকে বাঁচার জন্য তাবিজ ব্যবহার করার বিধান :</u>

জাদু ও বদনজর থেকে বাঁচার জন্য তাবিজ ব্যবহার করা যাবে না। বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে দেখা যায়, একটি বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলেই দাদী ও নারীরা বাচ্চার হাতে পায়ে ও গলায় কত ধরনের তাবিজ ঝুলায়! কোনো অবস্থাতেই তাবিজ ঝুলানো যাবে না। নবী ﷺ বলেন,

"من تعلَّقَ تميمةً فقد أشرك"

যে তামীমা (তাবীয) ঝুলায়, সে শিরক করেছে।[৯০]

তাবিজ ব্যবহার করলে কাজ হয় কেন?

তাবিজ ব্যবহার করলে কাজ হয় কেন সে বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহুর একটি আছার উল্লেখ করি।

عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ " . قَالَتْ قُلْتُ لِمَ تَقُولُ هَذَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلاَنٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِينِي فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا ذَاكِ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخَسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا " .

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ-এর স্ত্রী যাইনাব ﷺ আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন,

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, জাদু, তাবীয ও অবৈধ প্রেম ঘটানোর মন্ত্র শির্ক-এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি (যাইনাব) বলেন, আমি বললাম, আপনি এসব কী বলেন? আল্লাহর কসম! আমার চোখ হতে পানি পড়তো, আমি অমুক ইয়াহুদী কর্তৃক ঝাড়ফুঁক করাতাম। সে আমাকে ঝাড়ফুঁক করলে পানি পড়া বন্ধ হয়ে যেতো। 'আবদুল্লাহ ﷺ বললেন, এগুলো শয়তানের কাজ। সে নিজ হাতে চোখে যন্ত্রণা দেয়, যখন সে ঝাড়ফুঁক দেয় তখন সে বিরত থাকে। এর চেয়ে বরং তোমার জন্য এরূপ বললেই যথেষ্ট হতো, যেরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : "হে মানব জাতির রব! যন্ত্রণা দূর করে দিন, আরোগ্য দান করুন, আপনিই আরোগ্যদাতা, আপনার দেয়া নিরাময়ই যথার্থ নিরাময়, যার পরে আর কোনো রোগ বাকী থাকে না"।[৯১]

এই আছারের প্রতি আপনি লক্ষ্য করলে বিষয়টি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন যে, শয়তান মূলত মানুষকে ভয়-ভীতি দেখায়। যখন মানুষ তাবিজ ঝুলায় তখন শয়তান চলে যায়। কারণ শয়তানের কাজ হচ্ছে মানুষকে বিপথগামী করা, জাহান্নামী করা। যখন মানুষ তাবিজ ব্যবহার করে তখন সে শিরক করে। যার কারণে শয়তান তার থেকে চলে যায়।

জাদুর পরিবর্তে যাদু করার বিধান : কেউ যদি আপনাকে জাদু করে তাহলে এই জাদু ছুটানোর জন্য যাদু করা যাবে না। কেননা জাদু করা কুফরি। বরং আপনাকে বৈধ ঝাড়ফুঁক করতে হবে। আল-হামদুলিল্লাহ বর্তমানে সহিহ আকিদার অনেক আলেম আছেন, যারা ঝাড়ফুঁক করেন আপনি তাদের কাছে যান। আশা করা যায় সুস্থ হয়ে যাবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জাদু ও বদনজরের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করুন, আমীন।

[৯০] মুসনাদে আহমাদ হা : ১৬৭৮৫।

[৯১] আবু দাউদ হা : ৩৮৮৩।

অহংকার পতনের মূল

মোঃ আরিফ ইসলাম *

অহংকার মানব জীবনের এক জঘন্য স্বভাব। একজন মানুষের মধ্যে অহংকার যত বেশি জায়গা দখল করে নিবে মানুষের চোখে সে তত বেশি ঘৃণিত হবে। অহংকারী ব্যক্তিকে মন থেকে না কেউ সম্মান করে আর না কেউ শ্রদ্ধা করে। তাকে কেউ ভালোবাসে না। অহংকার এমন একটি ঘৃণিত স্বভাব সেটি পবিত্র কুরআন মাজীদের একটি আয়াতের মর্ম থেকে বুঝা যায়। অহংকারের জন্য মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও অন্যকে হেয় করে থাকে। এই জন্য ইসলামে অহংকার করাকে চরমভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রিয় পাঠক, আপনরা নিশ্চয় আবগত আছেন যে, 'যখন আল্লাহ তা'আলা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করেন, তখন সকল ফেরেশতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, তোমরা সকলে আদমকে সিজদা করো। তখন তার হুকুম মোতাবেক সকল ফেরেশতা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সিজদা করলো করলো, কিন্তু ইবলিস ব্যতীত।' এখানে একটি প্রশ্ন উঠে আসে যে, তখনো তো সে বিতাড়িত শয়তান হয়নি বা তার আগে কোনো শয়তান ছিল না, তাহলে কিসে তাকে সিজদা করতে বাধা দিলো? অবশ্য সে উত্তরটি আল্লাহ তা'আলা তার পবিত্র কালামের মধ্যেই বর্ণনা করে দিয়েছেন। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তার পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ করেছেন :

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾

অর্থাৎ, আর যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম যে, তোমরা আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলে সিজদা করলো; সে অগ্রাহ্য করলো ও অহংকার করলো এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।[৯২]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর বড় মর্যাদার কথা বর্ণনা করে মানুষের উপরে তার বড় অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করেছেন এবং তাদেরকে আদম (আলাইহিস সালাম)-এর সামনে সিজদা করার নির্দেশ দেওয়ার সংবাদ দিয়েছেন। আদমের (আলাইহিস সালাম) সম্মানে আল্লাহ তা'আলা মালাইকাকে সিজদা করতে বললে ইবলিস ছাড়া সবাই তার সিজদা করলো। সে ছিল জিন জাতির অন্তর্ভক্ত। কাতাদাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আল্লাহর দুশমন ইবলিসের আদম (আলাইহিস সালাম) কে সিজদা না করার কারণ হলো সে অহংকার ও হিংসা করেছিল। আর এই হিংসা করার কারণ ছিল আদম (আলাইহিস সালাম)-কে আল্লাহর মর্যাদা প্রদান। ইবলিস বলেছিল, আমি আগুন থেকে সৃষ্টি, আর আদমকে তৈরী করা হয়েছে মাটি থেকে। অতএব, ইবলিসের প্রথম ভুল ছিল তার আত্ম অহংকার। যে কারণে ইবলিস আদম (আলাইহিস সালাম) -কে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল। আমরা লক্ষ্য করলে পরবর্তী হাদীসে দেখতে পাবো, কাতাদাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন যে, এই অহংকারের পাপই ছিল সর্বপ্রথম পাপ যা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সিজদা করা হতে ইবলিসকে বিরত রেখেছিল।[৯৩]

বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না।[৯৪]

এই অহংকার, কুফর এবং অবাধ্যতার কারণেই ইবলিসের জীবনে অভিসম্পাতের গলাবন্ধ লেগে যায় এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হয়ে তাঁর দরবার হতে বিতাড়িত হয়ে যায়।

শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা অনত্র বলেন,

﴿وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا﴾

অর্থ : হে আদম সন্তান তুমি পৃথিবীতে অহংকার করে চলো না। নিশ্চয়ই তুমি যমীনকে ধ্বংস করতে পারবে না এবং পাহাড়ের উচ্চতায়ও পৌঁছতে পারবে না।[৯৫]

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র আরো বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ﴾

---

* অধ্যয়নরত, এম,এ কামিল ১ম বর্ষ, তাফসির বিভাগ, সরকারি মাদ্রাসা ই-আলিয়া, ঢাকা এবং বিএসসি ইন BBB , IIUSTB, সাভার, ঢাকা

[৯২] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত : ৩৪।

[৯৩] ইব্ন আবী হাতিম ১/১২৩।

[৯৪] সহীহ মুসলিম- ১/৯৩।

[৯৫] সূরা আল-ইসরা আয়াত : ৩৭।

অর্থ : এটা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে, তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না।[৯৬]

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

অর্থ : অহংকারবশত : তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং অহংকার করে বিচরণ করো না, কারণ আল্লাহ্ কোনো অহংকারীকে পছন্দ করেন না। [৯৭]

উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের জন্য অহংকার করাকে অপছন্দ ঘোষণা করেছেন। কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এই অপছন্দ কাজটি করে থাকে তাহলে সে আল্লাহর কথার বিরোধিতা করলো। আর আল্লাহর কথার বিরোধিতা মানে তাকে সে অমান্য করলো। আর আল্লাহকে অমান্য করা মানে জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নিল। মানুষ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তাদের মধ্যে কেউ হয়ত সুন্দর, কেউ বা কুৎসিত, কেউ বা লম্বা কেউ বা খাটো। কেউ হয়তো সম্পদশালী কেউ বা সম্পদহীন। যে যেমনি হোক না কেন কাউকে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। কেননা, কোনো ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো সুন্দর বা কালো, ধনী বা গরীব, খাটো বা লম্বা হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে না। আল্লাহ তা'আলা যাকে যেমনভাবে চেয়েছেন তেমনভাবে সৃষ্টি করেছেন। এতে কেউ কাউকে ছোট করে দেখা মানে আল্লাহর সৃষ্টিকে ছোট করে দেখা। আর যাদেরকে একটু সুন্দর বা সম্পদশালী করে দিয়েছেন তাদের অহংকার করারও কিছু নেই। কেননা, অসুন্দর আছে বলেই সুন্দরের মর্যাদা আছে, গবীব আছে বলেই ধনীদের দাম রয়েছে। অন্যথায় পৃথিবীতে সবাই যদি সুন্দর হতো তাহলে তাদেরকে কেউ আলাদা করে মার্যাদা দিত না। সবাই ধনী হলে তখন ধনীদেরও কোনো দাম থাকতো না। সুতরাং, আল্লাহ তা'আলা সবকিছু নিখুঁত ভাবেই সৃষ্টি করেছেন।

অহংকার-এর আভিধানিক অর্থ : আল্লামা ইবনে ফারেস (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, অহংকার অর্থ হলো- বড়ত্ব, বড়াই ইত্যাদি। আল্লামা ইবনে মানযুর এর মতে, الكبر শব্দটিতে কাফটি যের বিশিষ্ট হলে তখন অর্থ দাঁড়াবে বড়ত্ব, অহংকার ও দাম্ভিকতা।

তবে কারো কারো মতে, তাকাব্বুর ও ইস্তিকবার শব্দটির মতলব হল- বড়ত্ব, দাম্ভিকতা ও অহমিকা ।[৯৮]

কিবির বা অহংকারের শরঈ পরিভাষা : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কেউ বলল, মানুষ তো সুন্দর কাপড় পরিধান করতে পছন্দ করে, সুন্দর জুতা পরিধান করতে পছন্দ করে, এসবকে কি অহংকার বলা হবে? জবাবে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহ পাক নিজেই সুন্দর, তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। (অতএব সে হিসেবে সুন্দর কাপড় পরিধান করা অহংকার নয়) অহংকার হল, সত্যকে গোপন করা এবং মানুষকে নিকৃষ্ট বলে জানা।[৯৯]

উক্ত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুইটি অংশে অহংকারের সংজ্ঞা তুলে ধরেছেন–

১. সত্য গ্রহণে অস্বীকার করা : হককে অস্বীকার করা, হককে গ্রহণ না করে তার প্রতি অবজ্ঞা করা এবং তা থেকে বিরত থাকা। বর্তমানে আমরা বেশিরভাগ মানুষকে দেখতে পাই, যখন তাদের নিকট এমন কোনো লোক দাওয়াত নিয়ে আসে যে বয়স বা সম্মানের দিক দিয়ে তার থেকে ছোট, তখন তার কথার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। আর তা যদি তাদের চিন্তাধারা ও আমলের পরিপন্থী হয়, তাহলে তা অস্বীকার করে।

আর বেশির ভাগ মানুষের স্বভাব হল, যে লোকটি তাদের নিকট দাওয়াত নিয়ে আসবে, তাকে ছোট মনে করবে এবং তার বিরোধিতায় অবিচল থাকবে, যদিও কল্যাণ নিহিত থাকে সত্য ও হকের আনুগত্যের মাঝে। তারা যে অন্যায়ের ওপর অটুট রয়েছে তাতে তাদের ক্ষতি ব্যতীত আর কোনো কল্যাণ অবশিষ্ট থাকে না। আমাদের সমাজে এ ধরনের লোকের অভাব নেই

[৯৬] *সূরা আন-নাহল আয়াত : ২৩।*
[৯৭] *সূরা লুকমান আয়াত-১৮।*
[৯৮] *লিসানুল আরব খণ্ড: ৫০ পৃষ্ঠা : ১২৫।*
[৯৯] *সহীহ মুসলিম হা : ৯১।*

বললেই চলে। বিশেষ করে, ছোট পরিসরে এ ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটতে থাকে।

অহংকারকারীরা যে কারণে অপরের কাছ থেকে সত্যকে গ্রহণ করে না তা হলো- তার ধারণা, অপরের কাছ থেকে সত্য গ্রহণ করলে তার সম্মানহানি হবে এবং মানুষ তাকে নিয়ে হাসা-হাসি করবে; বরং সে লোকটিকেই বড় মনে করবে এবং তাকেই মানবে। অবশেষে বাধ্য হয়ে আমাকেই তাদের অনুসারী হতে হবে।

কিন্তু এ অহংকার যদি বুঝতে পারত, তার জন্য সত্যিকার ইজ্জত ও সম্মান সত্যের অনুসরণ ও অনুগত্য করার মাঝে, মিথ্যের মধ্যে ডুবে থাকাতে নয়, তাহলে সে অবশ্যই সফলকাম হত।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবু মুসা আশয়ারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট চিঠি লিখেন-

'তুমি কোনো বিষয়ে ফায়সালা দেওয়ার পর যদি সত্য ও সঠিক কিছু দেখতে পাও, তাহলে তা থেকে ফিরে আসতে যেন তোমার নফস তোমাকে বাধা না দেয়। কারণ, সত্য চিরন্তন, সত্যের পথে ফিরে আসা বাতিলের মধ্যে সময় নষ্ট করার চেয়ে উত্তম।[১০০]

আব্দুর রহমান ইবন মাহদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, একবার আমরা জানাযায় উপস্থিত হলাম, সেখানে কাজী উবাইদুল্লহ ইবনুল হাসান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও উপস্থিত হলেন। আমি তাকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি ভুল উত্তর দেন। আমি তাকে বললাম, 'আল্লাহ পাক আপনাকে সংশোধন করে দিন। এ মাসআলার সঠিক উত্তর এভাবে .....। তিনি কিছু সময় মাথা নিচু করে চুপ করে বসে থাকলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে বললেন, 'আমি আমার কথা থেকে ফিরে এলাম, আমি লজ্জিত। সত্য গ্রহণ করে লজ্জিত হওয়া আমার নিকট মিথ্যার মাঝে থেকে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার চেয়ে অধিক উত্তম।[১০১]

২. মানুষকে নিকৃষ্ট জানা : মানুষকে নিকৃষ্ট মনে করা, ছোট মনে করা ও অবজ্ঞা করা ইত্যাদি। মানুষের গুনের থেকে নিজের গুনকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা না থাকা।

[১০০] *দারাকুতনী, খণ্ড নং : ৪, পৃষ্ঠা নং : ২০৬।*
[১০১] *তারিখে বাগদাদ, খণ্ড নং : ১০, পৃষ্ঠা নং : ৩০৭।*

অতএব স্মরণ রাখতে হবে, যারা মানুষকে মন্দ জানে তাদের কর্মেরই পরিণতি হল, মানুষ তাদেরকেও মন্দ জানবে। এ ধরনের লোকেরা মানুষের সুখ্যাতি নষ্ট এবং তাদের যোগ্যতাকে লাঞ্ছিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। সে অন্যদের ওপর তার নিজের বড়ত্ব ও উচ্চ মর্যাদা জাহির করার লক্ষ্যে মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করে ও ছোট করে। মানুষের সম্মানহানি ঘটানোর উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করে ও অপবাদ রটায়। অহংকারীরা কখনোই মানুষের চোখে ভালো হতে পারে না আর মানুষও তাদেরকে ভালো নজরে দেখে না।

অহংকারী তার কৃতকর্ম দ্বারা কখনোই উচ্চ মর্যাদা বা সম্মান লাভ করতে সক্ষম নয়। তাই সে নিজের সম্মান লাভ করতে না পেরে কিংবা নিজের মর্যাদা ঠিক রাখার লক্ষ্যে অন্যদের কৃতিত্ব নষ্ট করে এবং তাদের মান-মর্যাদাকে খাটো করে দেখায়।

❖ **অহংকার ও আত্মতুষ্টির মাঝে পার্থক্য :** আবু ওহাব আল-মারওয়ারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর কাছে জানতে চাইলাম, 'কিবির কী জিনিস?' জবাবে তিনি বললেন, 'মানুষকে অবজ্ঞা করা।'

তারপর জানতে চাইলাম, 'উজ্বর কী জিনিস?' জবাবে তিনি বললেন, 'তুমি এটা মনে করলে যে, তোমার নিকট এমন কিছু আছে যা অন্যদের মাঝে নেই।' এরপর বললেন, 'নামাযীদের মধ্যে উজ্বর বা আত্মতৃপ্তির চেয়ে খারাপ আর কোনো জিনিস আমি দেখতে পাই না।'[১০২]

❖ **অহংকারের প্রকারভেদ :**

১. আল্লাহর প্রতি অহংকার : যেমন শয়তান, ফেরাউন, নমরুদ।

২. মানুষের প্রতি অহংকার : যেমন ধন, বংশ, জ্ঞান ইত্যাদির গর্বে মানুষকে হেয় করা।

৩. আচরণে অহংকার : মুখভঙ্গি, হাঁটার ভঙ্গি, কথা বলার ধরনে গর্ব প্রকাশ।

৪. ইবাদতে অহংকার : নিজের আমলকে বড় মনে করা এবং অন্যদের ছোট মনে করা।

[১০২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড : ৭ পৃষ্টা : ৪০৭।*

ক. শয়তানের অহংকার প্রথম অহংকার

কুরআন বর্ণিত রয়েছে, সৃষ্টির ইতিহাসেই অহংকার প্রথম প্রকাশ পায় ইবলিসের মাধ্যমে।

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

অর্থ : আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, 'তোমরা আদমকে সিজদা কর,' তখন তারা সিজদা করল, কিন্তু ইবলিস অস্বীকার করল, অহংকার করল এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।"[১০৩]

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর : ইবলিস নিজেকে আগুন থেকে সৃষ্ট এবং আদমকে মাটি থেকে সৃষ্ট জেনে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিল। এই অহংকারই তাকে আল্লাহর আদেশ অমান্য করতে বাধ্য করল।

খ. ফেরাউনের অহংকার

﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾

অর্থ : "সে (ফিরাউন) তার জাতিকে হেয়জ্ঞান করল, অতঃপর তারা তার কথা মানল। নিশ্চয়ই তারা ছিল পাপাচারী জাতি।"[১০৪]

অন্য আয়াতে বর্ণিত রয়েছে, فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

অর্থ : "সে বলল, 'আমি তোমাদের সর্বোচ্চ প্রভু।'[১০৫]

❖ **আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর :** ফেরাউন তার ক্ষমতা ও রাজত্বকে কেন্দ্র করে অহংকারী হয়ে পড়ে। এমনকি নিজেকে প্রভু বলে ঘোষণা করে। যার পরিণতিতে আল্লাহ তাকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দেন।

গ. নমরুদের অহংকার

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ...﴾

অর্থ : "আপনি কি দেখেননি ঐ ব্যক্তিকে, যে ইব্রাহীম ﷺ-এর সঙ্গে তার রব সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল, আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন..."[১০৬]

[১০৩] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ৩৪।*
[১০৪] *সূরা আয-যুখরফ আয়াত : ৫৪।*
[১০৫] *সূরা আন-নাযিআত আয়াত : ২৪।*

❖ **আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর :** নমরুদ বলেছিল, সে জীবন দেয় এবং মৃত্যু দেয়। ইব্রাহীম ﷺ বললেন, "আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, তুমি পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর।" তখন নমরুদ তা করতে ব্যর্থ হয়ে যায়।

৫. অহংকার সম্পর্কিত হাদীসসমূহ :

হাদীস ১ :

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.

অর্থ : "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[১০৭]

হাদীস ২ :

من تواضع لله رفعه الله.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় প্রদর্শন করে, আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদা দেন।"[১০৮]

হাদীস ৩ :

الكبر رداء الله، فمن نازعه ردائه قصمه الله.

অর্থ : "গর্ব আল্লাহর চাদর। কেউ যদি সেই গর্বে অংশীদার হতে চায়, আল্লাহ তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন।"[১০৯]

৬. অহংকারের ফলাফল :

● আখিরাতে বঞ্চনা : জান্নাতে প্রবেশ বন্ধ হয়ে যাবে।
● মানব সমাজে ঘৃণিত : মানুষ অহংকারীকে পছন্দ করে না।
● আল্লাহর অভিশাপ : অহংকারী ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকে।
● মানসিক অশান্তি : অহংকারী মানুষ নিজের অহংকারেই জ্বলে পুড়ে থাকে।

৭. বিনয়ের গুরত্ব : বিনয় বা তাওয়াযদু ইসলামের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা। নবীজি ﷺ ছিলেন সবচেয়ে বিনয়ী ব্যক্তি। তিনি কখনো অহংকার করতেন না, সবার

[১০৬] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২৫৮।*
[১০৭] *সহীহ মুসলিম হা : ৯১।*
[১০৮] *সহীহ মুসলিম।*
[১০৯] *সহীহ মুসলিম।*

সঙ্গে কোমল আচরণ করতেন। তিনি ছোটদেরকে সালাম দিতেন। বসস্কদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কেউ তার প্রতি অহংকার দেখালে তিনি তাদের সাথে উত্তম আচার ব্যবহার করতেন। কেননা, অহংকারীকে আল্লাহ্ তা'আলা কখনো পছন্দ করেন না। এটি ছিল তার রবের পক্ষ থেকে অন্যতম একটি নির্দেশ।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾

অর্থ : "তুমি পৃথিবীতে অহংকারভরে চলাফেরা করো না।"[১১০]

৮. বাস্তব জীবনের শিক্ষা :

➢ আজকের সমাজে অহংকার অনেক রূপে আসে। তার মধ্যে প্রচলিত কিছু রূপ নিচে তুলে ধরা হলো :

- উচ্চশিক্ষা নিয়ে অহংকার করা।
- সম্পদ নিয়ে অহংকার করা।
- গোষ্ঠী বা বংশ নিয়ে তুচ্ছভাব প্রকাশ করা।
- নিজের ইবাদতের অহংকার করা।
- ক্ষমতা নিয়ে অহংকার করা ।
- রূপের অহংকার করা। এটি সাধারণত নারীদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়। তবে এদিক দিয়ে পুরুষেরাও কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। বর্তমানে যুবসমাজের মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশির ভাগ যুবক নারীদের মতো করে নিজেদের প্রদর্শন করে থাকে। অথচ, রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে কড়া নির্দেশ দিয়ে বলেন, তিন শ্রেণীর ব্যক্তি কখনো জান্নাতে যাবে না, ১. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান ২. দায়ুস নারী ও পুরুষ ৩. পুরুষের ছদ্মবেশধারী নারী এবং নারীর ছদ্দবেশধারী পুরুষ।[১১১]

৯. অহংকার থেকে আমাদের করণীয় :

- অহংকার থেকে বেঁচে থাকা।
- বিনয়ী হওয়া।
- সত্য গ্রহণ করা।
- মানুষকে তুচ্ছ না করা।
- মিথ্যা থেকে নিজেকে দূরে রাখা।
- অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া।
- নিজের সম্পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার না করা।
- কারো সম্পর্কে না জেনে তার সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রকাশ না করা।
- কেউ সাহায্য চাইতে আসলে সাধ্যানুযায়ী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। কিছু দিতে না পারলে উত্তম কথা দিয়ে বিদায় করা।

১০. উপসংহার

'অহংকার পতনের মূল' এই কথাটি শুধু প্রবাদ নয় বরং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি চরম সত্য। কুরআন-হাদীসে অহংকারকে নিষিদ্ধ ও ধ্বংসের কারণ বলা হয়েছে। বিনয়, নম্রতা ও আত্মসমর্পণই একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। তাই আমাদের উচিৎ অহংকার বর্জন করে সবার সাথে উত্তম ব্যবহার করা।

শেষ কথা : যে ব্যক্তি বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে মর্যাদা দেন। আর যে ব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ তাকে অপমান করেন এটাই চিরন্তন সত্য। তাই আমাদের উচিত অহংকারকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করা এবং এর থেকে বেঁচে থাকা। যদি আমরা অন্যজনকে সম্মান দেই তাহলে মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সম্মান বাড়িয়ে দেবেন। "রাসূল ﷺ বলেছেন, দুনিয়াতে তুমি মুসাফিরের ন্যায় বসবাস করো।" একজন মুসাফির যখন কোনো জায়গায় সফরে যায় একদিকে সে যেমন সম্পদহীন অবস্থায় থাকে অপরদিকে সে অনেক বিনয়ী ও অহংকারমুক্ত অবস্থায় থাকে। আর তার এই যাত্রার সময় থাকে মাত্র কিছুদিনের জন্য। সুতরাং, আমাদেরকে সে চিন্তা মাথায় রেখে দুনিয়াতে বসবাস করা উচিৎ। প্রিয় পাঠক, তাই আসুন আমরা সকল অহংকারকে ভুলে গিয়ে, সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে, একে অপরের পাশে দাঁড়ায়। বিপদ-আপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই। অপরের সম্মানহানি হয় এমন কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে সকল প্রকার অহংকার থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

---

[১১০] *সূরা লুকমান আয়াত : ১৮।*
[১১১] *সহীহ নাসায়ী, হা : ২৫৬২।*

শুব্বানে পাতা صفحةالشبان

কাফী জীবনে তিনটি পত্রিকা সমাচার

মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম*

১. সাপ্তাহিক সত্যাগ্রহী :

মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী রহঃ তার সাংবাদিকতা জীবনে বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার পর সর্বপ্রথম সত্যাগ্রহী পত্রিকার মাধ্যমে পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। মূলত সাংবাদিকতার শুরু থেকে মাওলানা নির্ভীক ও সত্যাশ্রয়ী একটি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের চিন্তা পোষণ করছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে দীর্ঘ ছয় বছর পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করলেও নিজে পত্রিকা প্রকাশ করতে পারেননি। অব্যাহত সাধনা ও অবিরাম চেষ্টার ফলশ্রুতিতে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯ নভেম্বর কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রিটের ১০/৩ মুসলমান পাড়ার লিম থেকে প্রকাশ করেন সত্যাগ্রহী। পত্রিকার আকার ছিল ফুল স্কেপ তিন সেট, পুস্তক আকারে বাঁধা। পত্রিকাটি কলকাতার উনত্রিশ আপার রোডে অবস্থিত মোহাম্মদী প্রেস থেকে মুদ্রিত হতো। এর প্রতি সংখ্যা ফুল স্কেপ সাইজে ১২ থেকে ১৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত ছিল। চার পৃষ্ঠার কভারে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন থাকতো। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় কেবলমাত্র হিজরী সন ও তারিখ এবং এর মধ্যভাগে বিবিধ প্রসঙ্গ অংশে বাংলা সন ও তারিখ থাকতো। তবে কভার পৃষ্ঠায় বাংলা ইংরেজি ও আরবি সন তারিখ থাকতো। এ পত্রিকা প্রকাশকে তার জীবনের একটি লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন বলে বিভিন্ন সময় অভিহিত করেছেন।

মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী মুসলমানদের ওপর প্রতিবেশী হিন্দুদের অনীহা ও বঞ্চনাকে অত্যন্ত কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং ক্ষমতাহারা মুসলমানদের ভাষাহীন করুণ ও মলিন চেহারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি তার প্রকাশিত পত্রিকার মাধ্যমে একদিকে সজাতির জাগরণ অপরদিকে সকল অসত্য ও অন্যায়ের মূলোৎপাটন করতে চেয়েছিলেন। তিনি সত্যাগ্রহীর প্রথম সংখ্যায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে,

সত্য পথের আহ্বানকারীকে যেরূপ নির্ভীক, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকারীকে যেরূপ সত্যাগ্রহী ও অন্যায়ের প্রতিরোধকারীকে যেরূপ শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক, ঠিক সেইরূপ সংবাদপত্রের ভাষাকে জ্বলন্ত ও নির্ভীক, তাহার নীতিতে দৃঢ় ও সত্যাগ্রহী এবং তাহার লিখনীর গতিকেও চঞ্চল ও শক্তিশালী হইতে হইবে। জনমত গঠন করাই সংবাদপত্রের প্রধানতম কার্য ও জনমতকে সন্তুষ্ট রাখাই সংবাদসেবীদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে পারে না। সত্যের সাধক সত্যের দাস মাত্র। এ পথ সহজ নয় বড় দুর্গম। এ পথে বহু বাধা-বিঘ্ন ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় সত্যের সাধককে। গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলার জন্য সংস্কারের আগমন হয় না বরং স্রোতের গতিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যই তাদের আবির্ভাব। উদ্দেশ্য পথে বাধা-বিপত্তি যত কঠিনই হোক না কেন সত্যের সাধক অবিচল হিম্মত নিয়ে অগ্রসর হতে পারলে সমস্ত বাধা-বিপত্তি বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য এ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ তাকে করতেই হবে।

সত্যাগ্রহী সাপ্তাহিকির প্রতি সংখ্যায় নিয়মিত এক থেকে তিনটি মূল প্রবন্ধ থাকতো এবং সাধারণত এগুলো দীর্ঘ হতো। প্রত্যেক সংখ্যায় 'বিবিধ প্রসঙ্গ' শিরোনামে সাময়িক বিষয়ের ওপর সম্পাদকীয় মন্তব্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভদ্রোচিত তীব্র প্রতিবাদ এবং জাতীয় ও সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণের লক্ষ্যে গঠনমূলক আলোচনা ও পরামর্শ থাকত। 'বিশ্ব মোছলেম' শীর্ষক বিভাগে নিয়মিত ইসলামী জগতের খবরা-খবর ছাপা হত। 'দেশের কথা' কলামে পাক ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশিত হতো। আজাদী আন্দোলন,

* *শিক্ষক, রাযিয়া হিফজুল কোরআন মাদ্রাসা এন্ড ইসলামী একাডেমী, সদর, দিনাজপুর। পাঠাগার সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস দিনাজপুর জেলা।*

মুসলিম জাগরণ সম্পর্কীয় বিভিন্ন সভা সম্মেলন ও অধিবেশনসমূহে প্রদত্ত ভাষণ ও প্রস্তাবাদি পত্রিকায় গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হতো। 'নানা কথা' শিরোনামে অতি সংক্ষেপে ছোটখাটো সংবাদ সত্যাগ্রহীতে পরিবেশিত হতো। সত্যাগ্রহী দ্বিতীয় বছরের দেশের কথা শিরোনামটি স্থানীয় সংবাদ ও মফস্বলচিত্র ছাপা হত। এছাড়াও নিখিল প্রবাহ নামে একটি নতুন বিভাগ চালু করা হয়েছিল। এতে বহির্বিশ্বের অমুসলিম দেশে বিশেষ করে ইউরোপের খবর ব্যাপকভাবে পরিবেশন করা হতো।

সত্যাগ্রহী সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাপূর্ণ কোনো লেখা প্রকাশ করত না। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ায় এমন কোনো প্রবন্ধ ছাপা হতো না। পত্রিকার লেখকদের সম্পাদকের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয় এমন কোনো প্রবন্ধ না পাঠাতে অনুরোধ করা হতো। হানাফী-মোহাম্মদী বিদ্বেষমূলক লেখা সত্যাগ্রহী কেবল বর্জনই করেনি বরং যারা উভয়ের মাঝে বিতর্ক ও উত্তেজনা সৃষ্টিতে প্ররোচনা দিত তাদেরকে তিনি স্বজাতির মধ্যে আত্মঘাতী হিসেবে চিহ্নিত করে বিভিন্ন লেখায় সমালোচনা করেছেন এবং এ আত্মঘাতী কর্ম থেকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সাথে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় যারা সর্বদা চেষ্টা করেছেন তাদেরকে পত্রিকার মাধ্যমে ভূয়সী প্রশংসা করা হতো। সত্যাগ্রহীতে প্রকাশিত মূল প্রবন্ধ ও সাময়িক নিবন্ধের অধিকাংশ এবং সৃষ্টিধর্মী প্রায় সব রচনাই মাওলানা নিজে সম্পাদনা করতেন। কবিতা ও গল্প সত্যাগ্রহীতে অল্পই ছাপা হত।

পত্রিকাটি তিন বছর চালু ছিল। দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যার পর ১৩৩২ সালের পৌষের মধ্যভাগ হতে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত পুরো ৭ মাস বন্ধ থাকে। অতঃপর কলকাতার ২২ নং সুফিয়া স্ট্রিটে কান্তিক প্রেস হতে পুনরায় সত্যাগ্রহীর চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। নিজস্ব প্রেস এ ছাপানোর ঘোষণা থাকলেও তা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। মাওলানা তিনজন লোক দিয়ে পত্রিকাটি পরিচালনা করতেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মে-জুনে পত্রিকার ম্যানেজার মাওলানা আব্দুর রহমান শৈলী চাকরি ছেড়ে দিলে পত্রিকার প্রকাশনা জটিলতার সম্মুখীন হয়। প্রথম বছরে সত্যাগ্রহীর ৪৭টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বছর মাত্র ৪১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কিন্তু লোকবল, অর্থনৈতিক সংকট ও সার্বিক রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

পত্রিকাটির অল্প আয়ুস্কালের মধ্যেও মুসলিম সমাজের সংস্কার, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, দেশ ও জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল। 'দি মোসলমান' সম্পাদক মৌলভী মজিবর রহমান (১৮৮৫-১৯৩৯) এ পত্রিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন- সত্যাগ্রহী সম্পাদক মাওলানা কাফি দেশ ও সমাজ সেবায় তার জ্ঞান ও বিশ্বাসনুমোদিত সত্যকে সমুন্নত করতে সক্ষম হবেন।

সত্যাগ্রহী যেন সত্যের পতাকা বহন করতে এবং মিথ্যা অপসারণের বিপদসংকুল সংগ্রামে ধৈর্য ধারণ ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে পারে সেই প্রার্থনাই করি।

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) সত্যাগ্রহের দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণের সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বহু বাধা-বিপত্তি, অভাব, অনটন সহ্য করে এগিয়ে চলাকে মোবারকবাদ জানান। এছাড়াও মাওলানা কাফির অগ্রজ বিশিষ্ট আলিম ও রাজনীতিবিদ মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী, মোসলেম দর্পণ সম্পাদক হাকিম মশিউর রহমান, করটিয়ার জমিদার মৌলভী ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (১৮৪১-১৯৩৬), শিক্ষাবিদ ইব্রাহিম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৪)সহ আরো অনেকে পত্রিকার ব্যাপারে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। সত্যাগ্রহী পত্রিকার মাধ্যমে মাওলানা কাফি দেশ জাতি ও সমাজের যে খেদমত করেছেন তা অম্লান। তদানীন্তন পরাধীন মুসলিম সমাজে সত্যাগ্রহীর মতো নির্ভীক ইসলামিক চেতনায় উদ্দীপ্ত পত্রিকার সন্ধান খুব কমই চোখে পড়তো।

২. মাসিক তর্জুমানুল হাদীস : ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফীর সম্পাদনায় নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মুখপত্র হিসেবে পাবনা থেকে তর্জুমানুল হাদীস পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ আট বছর একাধারে

চলার পর প্রচারের সুবিধার্থে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে পত্রিকাটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও হাদীসে রাসূল ﷺ-এর শিক্ষা ও বিপ্লবী আদর্শকে মুসলিম সমাজে প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্য নিয়ে তর্জুমানুল হাদীস যাত্রা শুরু করেছিল। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

'কুরআন ও হাদীসে যে অমৃত মৃত পৃথিবীকে একবার পুনর্জীবিত করিয়াছিল, আজও তাহা অপরিবর্তিত ও বিশুদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে, যে নীতি ও বিধান জগতকে নবরূপ ও বর্ণ প্রদান করিয়াছিল, তাহার বৈপ্লবিক শক্তি এখনো অক্ষুণ্ন আছে। কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে সঠিকভাবে প্রচারিত এবং তাহার আদর্শকে মুসলিম জীবনে রূপায়িত করিতে পারিলেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল এবং মানব জীবন সার্থক হইবে। ইহা আহলে হাদীস আন্দোলনের মর্মকথা আর তর্জুমানুল হাদীসের ইহাই লক্ষ্য পথ'।

তর্জুমানুল হাদীসের সার্বিক পরিচালনা, সম্পাদনার ভার মূলত মাওলানা কাফীর ওপর ছিল। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে নিয়মিত প্রকাশনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এজন্য তর্জুমান মাঝে-মধ্যে দুই সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হতো। মাওলানার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি মোহাম্মদ আব্দুর রহমান তর্জুমানুল হাদীসের তৃতীয় বর্ষের এগারো সংখ্যা হতে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং মাওলানার নির্দেশনায় পত্রিকা প্রকাশে কার্য চালিয়ে যান।

মাসিক তর্জুমানুল হাদীসের প্রতি সংখ্যা ১০" × ৭" সাইজ কাগজে মুদ্রিত হত। পত্রিকাটি নির্দিষ্ট লেখা বা নির্দিষ্ট পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো না। এ পত্রিকার সর্বনিম্ন পৃষ্ঠা ৪০ আর সর্বোচ্চ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৪ পরিদৃষ্ট হয়। তবে সাধারণত ৪৮ থেকে ৫২ পৃষ্ঠার মধ্যেই অধিকাংশ সংখ্যা প্রকাশ পেতো। দুই পৃষ্ঠার কভারে প্রথমটিতে আরবি ও বাংলায় পত্রিকার নাম আর দ্বিতীয়টিতে লেখকদের লেখার সূচি থাকতো। সপ্তম বর্ষ থেকে কেবল বাংলায় পত্রিকার নাম লিখা হতো। প্রত্যেক সংখ্যায় উপরিভাগে লিখা হতো আহলে হাদীস আন্দোলনের মুখপত্র। আহলে হাদীসের পত্রিকা হওয়ায় স্বভাবতই এতে পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভা, সমাবেশ, সাংগঠনিক তৎপরতার সংবাদ জমঈয়তে আহলে হাদীস প্রেসের হিসাব-নিকাশের বিবরণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেতো।

মাসিক তর্জুমানুল হাদীসের বর্ষ শুরু সংখ্যায় আরবিতে ফাতেহা লেখা হতো এবং এর বঙ্গানুবাদও প্রকাশ করা হতো। এ নিয়ম পত্রিকা বন্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যথাযথভাবে পালিত হতো বলে দেখা যায়। তবে বাংলা খ্রিস্টাব্দ ও হিজরী সন তারিখ লেখার ব্যাপারে গোছানো কোনো নিয়ম পরিলক্ষিত হয়নি। এ পত্রিকার অধিকাংশ স্থান জুড়ে সাহিত্যিক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ গুরুত্ব সহকারে ছাপা হতো। এতে মাওলানা কাফি গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে কলাম লিখতেন। তর্জুমান অর্থনৈতিক দৈন্যতার কারণে বারবার বিঘ্নিত হয়েছে সত্য, তবে পত্রিকার অর্থের মূল উৎস বিজ্ঞাপনে অর্থের জন্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর বিরোধী কোনো বিজ্ঞাপন পত্রিকায় ছাপানো হয়নি।

তর্জুমানুল হাদীসের প্রতি সংখ্যার শেষ প্রান্তে আরবিতে ও বাংলাতে সাময়িক প্রসঙ্গ শীর্ষক বিষয়ে নিয়মিত দেশি-বিদেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও ঘটনাবলীর ওপর সম্পাদকের সম্পাদকীয় নিবন্ধ, মন্তব্য এবং জাতীয় ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হতো। সরকারের ভালো কাজের প্রশংসা ও অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করা হতো। দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় 'সতর্কতার সংকেত' নামক এক নিবন্ধে পাক সরকারের অন্যায়, প্রবৃত্তি পরায়ণতা, আত্মবঞ্চনা, ফাঁকা বুলী ইউরোপ ও আমেরিকার অন্ধ অনুকরণ প্রভৃতির বিরোধিতা করে সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়। এতে সরকার মাওলানার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ একুশে ফেব্রুয়ারি ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে পাবনা কোর্টে ডেকে আনেন এবং ভবিষ্যতে সংযতভাবে লেখার পরামর্শ দেন। এতে মাওলানা আরো প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন এবং 'আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ' শীর্ষক সম্পাদকীয় লিখে এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এতে

স্পষ্টভাবে সরকার ধমক দিয়ে তর্জুমান বন্ধ করতে পারে, কিন্তু তার বিবেককে বন্ধ করতে পারবেন না বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। এরপরও প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার সত্য ও স্পষ্টবাদী কলম স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সফল হয়নি। তারই স্পষ্টবাদী কলমটি প্রায় ১০ বছর একাধারে চলেছে।

তর্জুমান তার আদর্শ ও স্পষ্টবাদিতার দ্বারা তৎকালীন সুধী সমাজকে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর মোহাম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২) পাশ্চাত্যের চটকদার সাহিত্যিক আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং সক্রিয় গৌরবময় সংস্কৃতির প্রেরণা বিস্মিত মুসলমানদের সামনে আল এসলাম বন্ধের দীর্ঘদিন পর 'তর্জুমানুল হাদীস' আত্মপ্রকাশের ফলে বাংলা ও আসামের চেতনাহীন মুসলমানেরা পুনরায় আত্ম উপলব্ধির ও ইসলামকে সঠিকভাবে জানার সুযোগ পেয়েছিল বলে মন্তব্য করেন। মোহাম্মদ বারকাতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪) মাওলানা আকরাম খাঁসহ আরো অনেকে এ পত্রিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

মাওলানা কাফীর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মুসলিম মিল্লাতের সেবায় নিবেদিত থেকে পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছেন। তার ইন্তেকালের পরও প্রায় ১০ বছরকাল পত্রিকাটি চালু ছিল। তার মৃত্যুর পর ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই থেকে ১৯৬১ খ্রি. নভেম্বর পর্যন্ত আফতাব আহমদ রহমানির সম্পাদনায়, ১৯৬২ খ্রি. জানুয়ারি থেকে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অধ্যাপক শাইখ আব্দুর রহিম ও আফতাব আহমদ রহমানির যুগ্ম সম্পাদনায় এবং ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত শায়খ আব্দুর রহিমের সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ থেকে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাওলানা মওলা বখশ নদভীর সম্পাদনায় এবং সর্বশেষ ১৯৬৯ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত শাইখ আব্দুর রহিমের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এরপরই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কেবল ধর্ম বা সমাজ সচেতন করা তর্জুমান প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল না। সত্যিকার অর্থে তিনি এ পত্রিকার মাধ্যমে ইসলামকে মুসলিম সমাজের কাছে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। পত্রিকাটি শেষ দিন পর্যন্ত এ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি। পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যায় স্পষ্ট করে লেখা থাকতো কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ জীবন দর্শন ও কার্যক্রমের আদর্শবাদী ও অকুণ্ঠ প্রচারক। বাস্তবিক পক্ষে মাসিক তর্জুমানুল হাদীস শেষ সংখ্যা পর্যন্ত কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ পতাকাকে দীপ্ত ও শক্ত হাতে ধরে রেখেছিল।

৩. সাপ্তাহিক আরাফাত :

মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশির (১৯০০-১৯৬০) সম্পাদনায় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর সোমবার ৮৬ নং কাজী আলাউদ্দিন রোড ঢাকা থেকে পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। মাওলানা একাধারে পত্রিকার প্রকাশক, সম্পাদক ও মালিক ছিলেন। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ৯ মার্চ (দশম হিজরির ৮ জিলহজ) শুক্রবার অপরাহ্নে আরাফাতের বিশাল ময়দানে রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ পালনকারী বিশাল জনসমুদ্রের সামনে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেছিলেন এটি সাপ্তাহিক আরাফাতের চলার পথের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মূলত আরাফাতের ময়দানের ঘোষণার লক্ষ্যকেই পত্রিকার লক্ষ্য বলে স্থির করা হয় এবং সাপ্তাহিকের প্রথম সংখ্যায় আরাফাতের ময়দানে মহানবী ﷺ-এর বিদায় হজ্জের ভাষণের সম্পূর্ণটি অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়। আরাফাতের ময়দানে প্রদত্ত রাসূল ﷺ-এর ভাষণে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ও জাহিলি যুগের বংশানুক্রমিক শত্রুতার নির্মূল তথা পূর্ণাঙ্গ ইসলাম ও কুরআনকে দৃঢ়রূপে ধারণের আহ্বান করা হয়েছে। তাই একে অনুসরণ করে সাপ্তাহিক আরাফাত বহুধা বিভক্ত মুসলিম সমাজের ঐক্য সংহতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন বিধান তথা কুরআন ও সুন্নাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানায়। এজন্য একে প্রথম থেকেই মুসলিম সংহতির সেতুবন্ধন হিসেবে উল্লেখ করা হয়। আরাফাতের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে 'আমাদের কথা' শিরোনামে বলা হয়-

"ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দলাদলি ও জ্যেষ্ঠ পরস্থির অভিশাপে পাকিস্তান আদর্শের দৃঢ়তাকে হারাইতে বসিয়াছে, তাহার জাতীয় ঐক্য শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সে মরণ পথের যাত্রী হইয়াছে। এই ভয়াবহ সংকট

হইতে মুসলিম জাতিকে এবং তাহাদের রাষ্ট্র ইসলামী গণতন্ত্রকে রক্ষা করিতে হইলে আজ সকল প্রকার বৈষম্য বিরোধ ও দল পরস্তির বিরুদ্ধে হইবে, জাতীয় সংহতির প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্বশক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে এবং ইসলামী আদর্শের জয়গানে পাকিস্তানের আকাশ বাতাসকে ধ্বনিত অপ্রতিধ্বান্বিত করিয়া তুলিতে হইবে। দল ও ফিরকা বিশেষের আদর্শ নয় কাহারো ইমামত ও নেতৃত্বের জায়গার নয় আমাদের আদর্শ হইবে কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ। আর ইহারই সুর হইবে আমাদের গানের সুর! ইহা অখণ্ড জাতির মিলিত সম্পদ, ইহাতে সকলের দাবি আর অধিকার সমান।

ইহা কোনো মানুষের অথবা দল বিশেষের গবেষণা ও পরিকল্পনা নয়। জাবলে আরাফাতের উপত্যকায় পৃথিবীর সমুদয় মুসলমান যে আদর্শের বলে সকল বিভেদ ও বৈষম্যকে জলাঞ্জলি দিয়া একই জাতীয়তার আদর্শে মহিয়ান হইয়া ওঠেন, সাপ্তাহিক আরাফাত সেই আদর্শেই পাকিস্তানের জনগণকে অনুপ্রাণিত ও মহিমান্বিত করিতে চায়, প্রাদেশিক , গৈত্রী ও ভাষাগত বৈষম্যের ঊর্ধ্বে তথাকথিত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ফিরকাবন্দির পরিবর্তে তাহারা যাহাতে পুনরায় একটি সুসংহত ও শক্তিমান আদর্শভিত্তিক জাতিতে পরিণত হয় তাহার ঐ আহ্বান লইয়া আরাফাত দেশবাসীর দুয়ারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

আরাফাতের প্রতি সংখ্যা ফুল স্কেপ হাফ ডিমাই সাইজ কাগজে প্রকাশিত হতো। পৃষ্ঠা ৮, তবে এর কোনো কভার পৃষ্ঠা থাকত না। পত্রিকাটির বার্ষিক চাঁদা সাড়ে ছয় টাকা। ষান্মাষিক সাড়ে তিন টাকা এবং প্রতি সংখ্যা দুই আনা। ১৩ বর্ষের প্রথম সংখ্যার দাম ধরা হয় ১৬ টাকা। প্রতি সোমবারে পত্রিকাটি প্রকাশ পেত। পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলামে নিয়মিতভাবে স্বরচিত বিষয় অবলম্বনে নির্বাচিত হাদীসের বঙ্গানুবাদ এবং দ্বিতীয় কলামের নির্দিষ্ট বিষয়ে কুরআন মাজীদ হতে বাংলা তর্জমা দেওয়া হতো। আর তৃতীয় কলামের খোলাফায়ে রাশিদীনের নীতি, আদর্শ, শাসন পদ্ধতি, বাণী, উপদেশ, আচরণ প্রভৃতির বিবরণ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হতে বঙ্গানুবাদ করে পরিবেশন করা হতো। এসব সুনির্বাচিত আকর্ষণীয় শিরোনামে বর্ণিত কুরআন হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের বাণী, মুসলমানদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বহু সমস্যার সমাধানের পথ এ পত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

আরাফাতের প্রতি সংখ্যায় 'জাহানে ইসলাম' শীর্ষক একটি বিভাগ থাকতো। এতে মুসলিম জগতের গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর প্রকাশিত হতো। দু একটি সংখ্যা ব্যতীত প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় পাকিস্তানের খবর নামে একটি কলাম থাকতো। এতে পাকিস্তানের রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক ও বিভিন্ন বিষয়ক খবরাখবর প্রকাশিত হতো। তৎকালে অনেক ইসলামী পত্রিকায় মহিলাদের জন্য কোনো বিভাগ ছিল না। মাওলানা কাফি তার আরাফাতে মহিলাদের ইসলামী আদর্শের জ্ঞান চর্চা করার সুযোগ দানের জন্য আরাফাতে 'খাওয়াতীনে ইসলাম' নামে একটি বিশেষ বিভাগ রেখেছিলেন যাতে কেবল মহিলারাই লিখতেন। মাওলানা কাফির ইন্তেকালের কারণে তিনি এটাকে পরিণত অবস্থায় দেখে যেতে পারেননি। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে আরাফাতের সংখ্যাটি তার সম্পাদনায় শেষ সংখ্যা। তার স্বল্পকালীন সময়ের সম্পাদনায় পত্রিকাটি এদেশের সুধীমহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। আবুল কালাম শামসুদ্দিন এ পত্রিকাকে একটি উচ্চাঙ্গের ধর্মীয় পত্রিকা বলে অভিহিত করেছেন।

তদানীন্তন তোর ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত জামালপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও মাওলানা কাফির দীর্ঘদিনের সহকর্মী মৌলভী মোহাম্মদ আব্দুর রহমান 'সাপ্তাহিক আরাফাত' সম্বন্ধে তার মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে তৎকালের নীতিবিবর্জিত অধিকাংশ পত্র-পত্র পত্রিকার মধ্যে আরাফাতকে দলনিরপেক্ষ স্বাধীন নির্ভয় প্রচারক, সতর্কতার বংশীবাদক, মুসলিম সংহতির নির্ভীক সৈনিক ও হক ও বাতিলের পার্থক্য নির্দেশক বলে অভিহিত করেন।

মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফি আল-কুরাইশীর স্মৃতির সাথে সাপ্তাহিক আরাফাতের নাম জড়িয়ে আছে। এ পত্রিকাটি অনেকের হাত বদল করে এখনো অব্যাহত আছে। সাপ্তাহিক আরাফাতের অবয়ব পরিবর্তন হলেও মাওলানার উত্তরসূরিরা এখনো পত্রিকাটিকে সঠিক উদ্দেশ্যেই পরিচালনা করছেন। ❑❑

কবিতার সম্ভাহার

الأبيات الشعرية

কবর দেশের যাত্রী

ইউসুফ আল আজাদ*

কবর দেশের যাত্রী হয়ে
কিসের বড়াই কর,
সাদা কাফন পরতে হবে
যতই পোশাক পর।
কবর দেশের যাত্রী তুমি
কিসের বাড়ি বানাও,
এই দুনিয়া নয়রে কিছু
সব জনাকে জানাও।
কবর দেশের যাত্রী তুমি
করছ কিসের খেলা
পশ্চিমেতে চেয়ে দেখ
অস্ত প্রায়ই বেলা।
অস্ত গেলে বেলা তোমার
সাঙ্গ হবে সব,
থামবে তোমার সব আয়োজন
থামবে কলরব।
অস্ত গেলে জীবন বেলা
উঠবে না'ক ফের,
দিন থাকতে হও হুশিয়ার
সময় আছে ঢের।
দিন ফুরালে কেউ কারো নয়
কেউ যাবে না সাথে,
সব রেখে বিদায় দিবে
শূন্য খালি হাতে।

* সহকারী অধ্যাপক, হাবলা টেংগুরিয়াপাড়া ফাযিল মাদরাসা, টাঙ্গাইল

ওগো আমার প্রভু

জাবের বিন হানিফ*

যাবতীয় শোকর তোমার
ওগো আমার প্রভু!
তোমার এইসব অবদানরাজী
ভুলতে চাই না কভু।
তুমি করেছো আমায় সৃষ্টি।
তোমারই তো সৃষ্টি প্রভু, এই গ্রহ-নক্ষত্র
সপ্ত-আকাশ যেন তোমার উন্মুক্ত সাত-পত্র।
তুমি আমার সবচেয়ে কাছের
সব তোমারই হাতে!
তুমিই তো আমায় রক্ষা করো
নিশি আর প্রভাতে।
তোমার জন্যই আমার জীবন
তোমার জন্যই মরা
তাইতো, সব ছেড়ে আবার,
তোমার দিকেই ফেরা।

* মুতা : ৩য় বর্ষ, এম. এম. আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন (১) *পিতা-মাতা রাগবশত সন্তানের গালে চড় বসিয়ে দেয় কিংবা অন্য কেউ কারো গালে চড় বসিয়ে দেয়। এটা শুনেছি বৈধ নয়, তাই বিষয়টি পরিষ্কার করে বলবেন?*

আয়মান, নিকলা, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর : রাগবশত বা যে কোনো কারণেই হোক কারো চেহারায় আঘাত করা বৈধ নয়। এই আঘাত বা প্রহার আদব শিক্ষাদান বা অন্যায় কর্মের শাস্তিস্বরূপ যা-ই হোক না কেন। নাবী ﷺ কারো চেহারায় মারা পুরোপুরি নিষেধ করেছেন। এ মর্মে সুস্পষ্ট হাদীস নিম্নরূপ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ»

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তোমাদের কেউ যখন তার ভাইকে (কাউকে) প্রহার করবে (বা লড়াই করবে) মুখমণ্ডলে আঘাত করা থেকে বেঁচে থাকবে।[১]

সান'আনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এ হাদীস দলীল হলো কারো চেহারায় প্রহার করা হারাম হওয়ার বিষয়ে; এ থেকে বাঁচতে হবে। চেহারায় মারবে না বা চড় দেবে না। শরীয়তে কোনো দণ্ড কায়েম করার বেলায় এমনকি জিহাদের ময়দানে চেহারায় আঘাত করা যাবে না।

আশ-শাইখ বিন বা'য রহমাতুল্লাহি আলাইহি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন. মানুষ এমনকি চতুস্পদ জন্তুর চেহারায়ও আঘাত করা হারাম, কারণ এ প্রসঙ্গে নাবী ﷺ-এর হাদীসে ব্যাপকতা রয়েছে।[২]

তোমাদের কেউ যখন মারতে যাবে তখন চেহারায় মারা থেকে বেঁচে থাকবে।

[১] *সহীহ বুখারী হা : ২৫৬০, সহীহ মুসলিম হা: ২৬১২।*
[২] *সুবুলুস সালাম-২/৬৬৭।*

তাই চতুস্পদ জন্তু হোক বা অন্যান্য কিছু হোক, আর স্ত্রী হোক, সন্তান হোক বা খাদেম হোক কারো চেহারায় আঘাত বা প্রহার করা যাবে না।

প্রশ্ন (২) : *আমি একটি নতুন ভাড়া বাসায় উঠেছি। এখানে কেমন যেন সমস্যা হচ্ছে। সন্তানদের লেখা পড়ায় মন বসছে না। আমারও শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী?*

মুহিব্বুল্লাহ, মুন্সিগঞ্জ।

উত্তর : কোনো কোনো বাসাবাড়িতে বসবাস করা আপনার জন্য কল্যাণকর নাও হতে পারে। তবু আপনি কিছুটা অপেক্ষা করে দেখুন সব ঠিকঠাক হয়ে যায় কি না? যদি সবকিছু ঠিকঠাক না হয়, তাহলে আপনার উচিত হবে বাসাটি বদলে ফেলা। শরীয়ার আলোকে জানা যায়, কিছু বাহন আছে যা কুলক্ষণে, কিছু বাড়িঘর আছে যেসব কুলক্ষণে এবং কতিপয় স্ত্রী আছে যারা কু-লক্ষণে। তাই আপনি অবস্থাদৃষ্টে আপনার বাসা বদল করে নিতে পারেন এটাই শ্রেয় হবে। নাবী ﷺ এরশাদ করেছেন,

الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الفَرَسِ، وَالمَرْأَةِ، وَالدَّارِ.

যদি অমঙ্গল থেকে থাকে তবে তা আছে : ঘোড়া, মহিলা ও ঘরের মাঝে।

প্রশ্ন (৩) : *সম্প্রতি ঢাকার উত্তরায় একটি প্রশিক্ষণ বিমান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে আছড়ে পড়লে অনেক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী দগ্ধ হয়ে মারা যায়। কেউ শিক্ষার্থীদের বাঁচাতে গিয়ে দগ্ধ হয়ে মারা যায়। শরীয়তে তাদের মৃত্যুর হুকুম কী?*

মাহফুজুর রহমান, ঢাকা উত্তরা

উত্তর : দুর্ঘটনাকবলিত বিমান থেকে আগুন লেগে যারা মারা গেছেন প্রত্যেক এমন মুসলিম ব্যক্তিই শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবেন ইন শা-আল্লাহ। জাবির বিন আতীক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ

ইরশাদ করেন : وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ পুড়ে মৃত ব্যক্তি শহীদ।[৩] (পূর্ণ হাদীসের অংশ বিশেষ)।

আগুন লাগা ব্যক্তিদের সাহায্য করতে গিয়ে কেউ যদি পুড়ে মারা যায় তার হুকুম প্রসঙ্গে শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, এমন ব্যক্তি মুসলিম হলে শাহাদাতের চেয়ে বেশি মর্যাদা তিনি প্রাপ্ত হবেন। তিনি একদিকে নিজে পুড়ে মারা গেলেন, অপরদিকে অন্যদেরকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা চালালেন।[৪]

প্রশ্ন (৪) : যাদের ভাষা আরবী নয়, তাদের জন্য কি সালাতে বাংলায় দু'আ করা জায়েয?

সিরাজুল ইসলাম, পূর্বধলা, নেত্রকোণা

উত্তর : সালাতের ভিতরে আরবী ছাড়া অন্যান্য ভাষায় দু'আ করা যাবে কি না, এ ব্যাপরে আলেমদের একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় দু'আ করা জায়েয নেই। আরেক শ্রেণীর আলেমের মতে, যাদের ভাষা আরবী নয় কিংবা যারা ভালোভাবে আরবী বলতে ও পড়তে পারে না, তাদের জন্য নিজ নিজ ভাষায় দু'আ করা জায়েয আছে।

এক্ষেত্রে সঠিক কথা হচ্ছে, যারা আরবী বুঝে তাদের জন্য আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় দু'আ করা উচিৎ নয়। কিন্তু যারা আরবী বুঝতে বা পড়তে অক্ষম তাদের জন্য নিজ নিজ ভাষায় সালাতের মধ্যে দু'আ করা বৈধ। এটাই প্রাধান্যযোগ্য মত।[৫]

প্রশ্ন (৫) : সালাতের মধ্যে দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণ চেয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা যাবে কি?

আজহারুল ইসলাম, মহম্মদপুর, মাগুরা।

উত্তর : আল্লামা আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, মুমিনদের জন্য সালাতের মধ্যে দু'আ করার স্থানগুলোতে দু'আ করা শরীয়তসম্মত। চাই নফল সালাত হোক অথবা ফরয সালাত হোক। সালাতের মধ্যে দু'আর স্থানগুলো হলো- সিজদাহ, দুই সিজদার মাঝে এবং সালাতের শেষের দিকে তাশাহ্হুদ এবং নবী করীম ﷺ-এর ওপর দুরূদ পাঠ করার পর ও সালাম ফিরানোর আগে।

সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ দুই সিজদার মাঝখানে আল্লাহর কাছে মাগফিরাত চাইতেন। দুই সিজদার মধ্যখানে নবী ﷺ এই দু'আ পাঠ করতেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَ ارْحَمْنِيْ وَ اهْدِنِيْ وَ عَافِنِيْ وارْزُقْنِيْ .

'আল্লাহুম্মাগফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াহ্দিনী, ওয়া আফিনী ওয়ারযুকনী'

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, হিদায়াত দান কর, মর্যাদা বৃদ্ধি কর এবং জীবিকা দান কর"।[৬]

নবী করীম ﷺ আরো বলেন,

أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم .

"তোমরা রুকুতে তোমাদের রবের বড়ত্ব বর্ণনা করো এবং সিজদাতে বেশি বেশি দু'আ করো। আশা করা যায় যে, সিজদাতে তোমাদের দু'আ কবুল করা হবে"।[৭]

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ আরো বলেছেন,

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء.

"বান্দা যখন সিজদায় থাকে তখন সে আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী থাকে। অতএব তোমরা সিজদায় বেশি বেশি দু'আ করো"।[৮]

সালাতের মধ্যে দু'আ করার ব্যাপারে অনুরূপ আরো হাদীস রয়েছে। এগুলো প্রমাণ করে যে, সালাতের

[৩] *আবু দাউদ হা : ২৩৮০৪, নাসাঈ হা : ১৮৪৬।*
[৪] *ফাতাওয়া বিন উসাইমিন : ২৫/৪৪৮।*
[৫] *সহীহ মুসলিম হা : ৪৮২।*
[৬] *তিরমিযী কিতাবুস সলাত হা : ২৮৪।*
[৭] *সহীহ মুসলিম কিতাবুস সালাত হা : ৭৩৮।*
[৮] *সহীহ মুসলিম কিতাবুস সালাত হা : ৭৪৪।*

মধ্যে দু'আ করা শরীয়তসম্মত। মুসল্লি সালাতের মধ্যে তাদের ইচ্ছা মোতাবেক দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণ চেয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে পারবে তবে তা মনে মনে পড়বে। হাদীসে বর্ণিত দু'আগুলো পাঠ করাই উত্তম।

☞ প্রশ্ন (৬) : সুদ মহাপাপ বা কাবীরা গুনাহ তা আমরা জানি, কিন্তু তার সত্তরের অধিক স্তর রয়েছে যার সর্বনিম্ন স্তর আপন মায়ের সাথে বিবাহ করা বা ব্যভিচার করার সমপর্যায়ের কথা বলা হয় এবং এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন হাদীসও পেশ করা হয়ে থাকে। বিষয়টি কি আসলেই সঠিক? দয়া করে আমাদের বিস্তারিত জানাবেন।

আলতাফ হোসেন, পঞ্চগড়

উত্তর : নিঃসন্দেহে সূদ একটি হারাম এবং চরম ঘৃণিত কাজ। যা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

সুদের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে নিম্নবর্ণিত হাদীসটি পেশ করা হয়ে থাকে।

الرِّبَا سَبْعُونَ جزأ أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ.

অর্থাৎ- সুদের সত্তরটি স্তর রয়েছে। সবচেয়ে নিম্নটি হল- নিজের মাকে বিবাহ করা।[৯]

তাছাড়া মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, এক দেরহাম পরিমাণ সুদ খাওয়া সত্তর বার যিনা করার চেয়েও মারাত্মক।

এসব হাদীস বক্তাদের মুখে মুখে এমনকি বিজ্ঞ 'আলেমদেরও যারা সর্বদা সহীহ হাদীসের কথা বলেন তাদের মুখে মুখেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। এসব হাদীসকে কেউ হাসান বা সহীহ বলেছেন, আবার কেউ মুনকার তথা সহীহ হাদীসবিরোধী ও বর্জনযোগ্য বলেছেন। কেননা এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোর প্রতিটি বর্ণনায় কোনো না কোনো যঈফ মাতরুক অথবা যাল হাদীস রচনাকারী রয়েছেন। বর্তমান বিশ্বের প্রথিতযশা শাইখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

ইমাম ইবনুল জাওযী তার বিখ্যাত গ্রন্থ আল মাওযুয়াত (২৪৭-২) এ বলেন : এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোতে সহীহ বলতে কিছুই নেই। শাইখ আব্দুর রহমান আল মুয়াল্লিমি ইয়ামানি বলেন : এ হাদীসগুলো নবী ﷺ হতে বিশুদ্ধ নয়।[১০]

আল্লামা আবু ইসহাক আল কুওইনী বলেন : এসব হাদীসের নিসবত বা সম্বোধন নবী ﷺ-এর দিকে করা কোনো ক্রমেই জায়েয নাই। তবে শাইখ নাসিরউদ্দীন আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখিত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[১১]

☞ প্রশ্ন (৭) : কুরআনুল কারীমে যেসব আয়াত দু'আ আকারে এসেছে, সেগুলো কি সিজদাতে পাঠ করা যাবে?

নাঈম গাজী, কালিয়া, নড়াইল।

উত্তর : আল্লামা আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, মুমিনদের জন্য সালাতের মধ্যে দু'আ করার স্থানগুলোতে কুরআনের দু'আ পাঠ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে তিলাওয়াতের নিয়তে পড়বে না, দু'আর নিয়তে পাঠ করবে। কেননা সালাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করা শরীয়তসম্মত নয়। কুরআনের দু'আ যেমন

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ.

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে নয়নশীতলকারী বানাও"।[১২]

অনুরূপ সূরা বাকারায় এসেছে,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করো এবং পরকালে কল্যাণ দান করো। আর আমাদেরকে জাহান্নামের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করো"।[১৩]

---

[৯] *ইবনু মাজাহ্- হা: ২২৭৪।*

[১০] *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমুয়া ১৫০ পৃষ্ঠা।*

[১১] *আল জামে' আস্-সহীহ হা : ৩৫৪১।*

[১২,১২] *সূরা ফুরকান আয়াত : ৭৪।*

[১৩] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২০১।*

সূরা আল-ইমরানের ৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا .

"হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করে দিও না"। এ ধরনের অন্যান্য দু'আ সিজদায় পাঠ করা জায়েয আছে। অতএব দু'আর নিয়তে কুরআনের দু'আগুলো সিজদায় পাঠ করা যাবে। কেননা রাসূল ﷺ সালাতের রুকু-সিজদায় কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন। সালাতে দাঁড়ানো অবস্থাতেই কুরআন তিলাওয়াত করা শরীয়তসম্মত।[১৪]

প্রশ্ন (৮) : ওযূ ছাড়া দু'আ কবুল হবে কি?

লোকমান শেখ, মধ্যনগর, সুনামগঞ্জ।

উত্তর : জ্বি হ্যাঁ। কবুল হবে, দু'আ করার জন্য অযু শর্ত নয়। সালাত, তাওয়াফ ইত্যাদি যেমন অযু ছাড়া করা যাবে না, তেমন কোনো শর্ত দু'আর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। হাদীসে এসেছে, 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদাই আল্লাহর যিকির-আযকার করতেন। অর্থাৎ সকল কাজে তিনি আল্লাহকে স্মরণ করতেন"[১৫] দু'আ যেহেতু আল্লাহর যিকিরের অন্তর্ভুক্ত তাই অযু ছাড়া করলেও ইন্ শা-আল্লাহ তা কবুল হবে।

প্রশ্ন (৯) : জুম'আর খুতবা চলাকালীন সময় সুন্নাত বা অন্য কোনো নামায পড়া যাবে?

আ: রহীম মোল্লা, দোহার, ঢাকা

উত্তর : খুতবা চলাকালীন সময়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায অবশ্যই পড়তে পারেন। হাদীস শরীফে এসেছে, "সুলাইক আল-গাতাফানী রাযিয়াল্লাহু আনহু জুম'আর দিন আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি বসে পড়লেন। তা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, হে সুলাইক! দাঁড়াও এবং দু রাক'আত সালাত আদায় করো ও তা সংক্ষিপ্ত করো"। তারপর তিনি ﷺ বললেন, "তোমাদের কেউ যদি ইমাম খুতবা দেয়া অবস্থায় মসজিদে আসে সে যেন দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নেয় এবং তা সংক্ষিপ্ত করে।"[১৬]

প্রশ্ন (১০) : *আমাদের সমাজে একশ্রেণির লোককে দেখি যে, তারা অযুর সময় গর্দান বা ঘাড় মাসাহ করেন। কিন্তু আহলে হাদীস ভাইদের তা করতে দেখি না। আমি জানতে চাই, আসলে কোনটি সঠিক? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জানতে চাই।*

মাজেদুল ইসলাম, হোমনা, কুমিল্লা

উত্তর : অযুতে গর্দান তথা ঘাড় মাসাহ করার বিষয়টি প্রমাণিত নয়। এ সংক্রান্ত যতগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলো যঈফ কিংবা জাল এবং তা সহীহ হাদীস বিরোধী। সাধারণত ঘাড় মাসাহ করার ব্যাপারে সুনান আবূ দাউদে বর্ণিত হাদীসটি পেশ করা হয়। যেখানে বলা হয়েছে যে, নাবী ﷺ মাথা মাসাহ করলেন এবং দুই কানের মধ্যবর্তী মাথার পেছন পর্যন্ত মাসাহ করলেন। প্রথমত হাদীসটি দুর্বল। শাইখ আলবানী রহমাহুল্লাহি আলাইহি এটিকে যঈফ বলে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়ত গর্দান বা ঘাড় আরো নিচে অবস্থিত। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা ঘাড় মাসাহ করা প্রমাণিত হতে পারে না। ইমাম গাযালী রহমাহুল্লাহি আলাইহি ঘাড় মাসাহ করার ব্যাপারে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, 'ঘাড় মাসাহ করা কেয়ামতের দিন শিকলবন্দি হওয়া থেকে মুক্তির গ্যারান্টি', হাদীসটি জাল। এটি নাবী ﷺ এর কোনো বাণী নয়। আল্লামা শাইখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ এ 'আমলটিকে বিদ'আত আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহমাহুল্লাহি আলাইহি বলেন "ঘাড় মাসাহ সংক্রান্ত নাবী ﷺ হতে বর্ণিত কোনো সহীহ হাদীস নেই"[১৭]।[১৮] শাইখ বিন বায রহমাহুল্লাহি আলাইহি বলেন "ঘাড় মাসাহ করা মুস্তাহাবও নয় এবং কোনো বিধানও নয়। মাসাহ হবে কেবলমাত্র মাথা এবং উভয় কানের"[১৯] শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহমাহুল্লাহি আলাইহি বলেন "নাবী ﷺ হতে একটিও সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি যে,

[১৪] *সহীহ মুসলিম হা : ৪৮০।*
[১৫] *সহীহ মুসলিম হা : ৫৫৮।*
[১৬] *সহীহ মুসলিম হা : ২০৬১।*
[১৭] *যাদুল মা'আদ হা : ১৯৫।*
[১৮] *যাদুল মা'আদ-১৯৫/১।*
[১৯] *মাজুম ফাতাওয়া বিন বায : ১০২।*

তিনি অযুতে ঘাড় মাসাহ করেছেন"। বরং অযুর সহীহ হাদীসগুলোতে ঘাড় মাসাহের কোনো আলোচনাই আসেনি। সুতরাং অধিকাংশ ওলামা যেমন- ইমাম মালিক শাফেঈ, আহমাদ প্রমুখের নিকট এ 'আমলটি মুস্তাহাবও নয়।[২০] সুতরাং ওযূর মধ্যে গর্দান তথা ঘাড় মাসাহ বর্জনীয়। আল্লাহু আ'লাম।

☞ প্রশ্ন (১১) : ***জনৈক ব্যক্তি কাবা ঘরের ছবি দেখিয়ে বলছিলেন যে, উক্ত ছবি দোকানে বা বাড়িতে ঝুলিয়ে রাখলে ব্যবসার উন্নতি হবে, সকল বালামুসিবত কেটে যাবে। কথাটি কি সত্য?***

হাদীসুর রহমান, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

উত্তর : জ্বি না। কথাটি মোটেও সত্য নয়। ইসলামে কাবা ঘরের ছবির ব্যাপারে এমন কিছুই বলা হয়নি। একশ্রেণির লোক তাদের অজ্ঞতাবশত এ ধরনের কথা বলে থাকে, ইসলামে যার কোনো ভিত্তি নেই। কেউ এ ধরনের বিশ্বাস রেখে তা করলে তা হবে গুনাহের বিষয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে এমন কাজ করল যা আমাদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত"[২১]

☞ প্রশ্ন (১২) : ***আমাদের দেশে বিভিন্নভাবে যিকর প্রচলিত। সুতরাং কোন পদ্ধতিটি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত? যিকির কি মনে মনেই করতে হবে নাকি উচ্চস্বরেও করা যায়?***

রায়হান শেখ, কাপাসিয়া, গাজীপুর

উত্তরঃ যিকর মানে হচ্ছে স্মরণ করা। আল্লাহকে যে কোনো সময় যে কোনোভাবে স্মরণ করাই হচ্ছে আল্লাহর যিকর। দৈনন্দিন প্রতিটি কাজের একেকটি দু'আ রয়েছে যেমন খাওয়া শুরু করার আগে দু'আ, ঘুমানোর সময় দু'আ ইত্যাদি। প্রতিটি দু'আই আল্লাহর যিকর। যিকর মনে মনে করতে হয়। যিকরের সময় লাফালাফি করা, চিৎকার করা, শরীর এবং মাথা অস্বাভাবিকভাবে ঝুলানো ইত্যাদি ইসলামে একেবারে নাজায়েয ও মারাত্মক গুনাহের কাজ এবং কুরআন সুন্নাহর পরিপন্থী 'আমল। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ যিকর করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে ঘোষণা করেছেন, "আর তুমি নিজ মনে আপন রবকে স্মরণ কর সকাল-সন্ধ্যায় অনুনয়-বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চস্বরে। আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না"[২২] সকল সময় আল্লাহর স্মরণ তাসবীহ, বিভিন্ন দু'আ-দরূদ মনে মনে পড়ার মাধ্যমে যিকর করতে হবে। যিকরের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনকে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিক-নির্দেশনার আলোকে সাজানো। অতএব শুধু সুনির্দিষ্ট কিছু যিকর পড়লে হবে না। যিকরের উদ্দেশ্য অনুধাবন করে সে অনুযায়ী 'আমল করতে হবে।

☞ প্রশ্ন (১৩) ***হিন্দুদের পূজা অনুষ্ঠানে দাওয়াত পেলে সেখানে যাওয়া বা কোনো কিছু খাওয়া কি জায়েয?***

সহেল রানা, বামনা, বরগুনা।

উত্তর : জ্বি না। পূজার অনুষ্ঠানে যাওয়া যাবে না। কারণ এর সাথে শির্ক জড়িত। আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, "তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না"[২৩]

শির্ক কবীরা গুনাহ। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা বলেন: রহমান-এর প্রিয় বান্দা তারাই যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না।[২৪]

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, তোমরা আল্লাহর শত্রু ইয়াহুদী, খ্রিস্টানদের উৎসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাক। কারণ তাদের ওপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি অবতীর্ণ হয়। আমি ভয় করছি যে, তা তোমাদের ওপরও পড়বে।[২৫] কুরআন মাজীদে আরো বলা হয়েছে, "তোমরা ভাল কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাক"[২৬] আমরা অন্য ধর্মকে অশ্রদ্ধা করব না বা অন্য ধর্মগুরুদের গালি দেবো না এবং সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করব। তবে তাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া থেকে বিরত থাকব। ❐❑

---

[২০] *মাজমুউল ফাতাওয়া ১২৭।*
[২১] *সহীহ মুসলিম হা : ৩২৪৩।*
[২২] *সূরা আল-আ'রাফ আয়াত : ২০৫।*
[২৩] *সূরা নিসা-আয়াত ৩৬।*
[২৪] *সূরা আল-ফুরকান আয়াত : ৭২।*
[২৫] *বায়হাকী হা : ৯০৭৬।*
[২৬] *সূরা আল-মায়িদাহ আয়াত : ২।*